দাম : পাঁচ টাকা

স্বস্তিকা

৬৪ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা ।। ৯ জানুয়ারি - ২০১২, ২৪ পৌষ - ১৪১৮

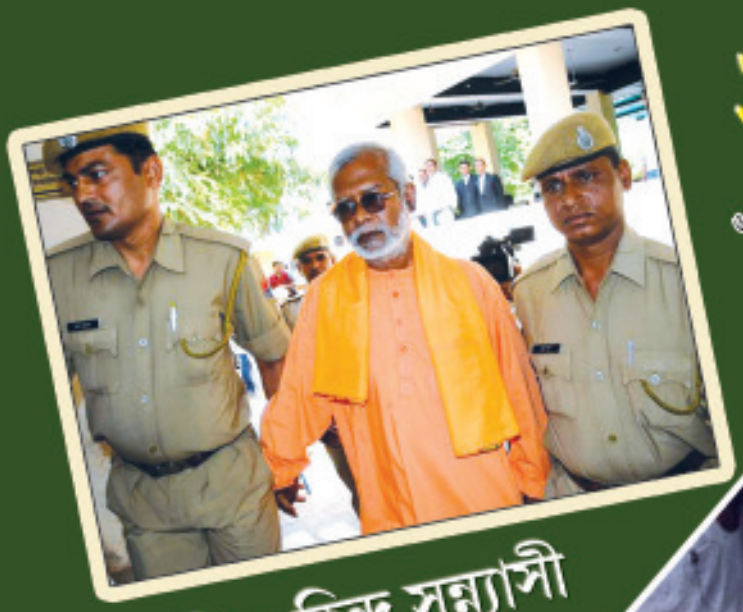

লাঞ্ছিত হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী অসীমানন্দ

রাশিয়ায় শ্রীমদ্ভগবত গীতা নিষিদ্ধ করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কয়েকটি চিত্র।

রাজনৈতিক হানাদারির কবলে শ্রীমদ্ভগবত গীতা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ❑ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ❑ ৬-৭

দুর্নীতি উচ্ছেদের প্রধান অস্ত্র 'জনমত', আইন সহায়ক মাত্র ❑ ৮

সম্মুখ সমরে কংগ্রেস-তৃণমূল ❑ ৯

বেদ, বিবেক ও বর্তমানের মধ্যে সমন্বয়ের
সাধক বিবেকানন্দ ❑ ডঃ স্বরূপ ঘোষ ❑ ১১

গীতা ও কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো ❑ এস এন সাহু ❑ ১৩

রাশিয়ার তমস্ক আদালতে গীতা-বিরোধীদের পশ্চাদ্‌পসরণ :
কুড়ি বছর বাদে হঠাৎ গীতা নিয়ে গণ্ডগোল কেন? ❑ ১৪

ভালুকের কবলে ভগবদ্‌গীতা ❑ তথাগত রায় ❑ ১৫

রাশিয়ায় গীতার ওপর আক্রমণ : এক গভীর চক্রান্ত ❑ নটরাজ ভারতী ❑ ১৭

তিন দশকের সাফল্য : অন্ধ্রে মাও-হানায় মৃতের সংখ্যা ২০১১-তেই সর্বনিম্ন ❑ ২০

খোলা চিঠি : শরিকি গোলমালে ইন্দিরা ইন্ধন
❑ সুন্দর মৌলিক ❑ ২১

মকর সংক্রান্তির মাহাত্ম্য ❑ পীতারুণ মুখোপাধ্যায় ❑ ২৩

রাষ্ট্রপতিকে লেখা চিঠিতে স্বামী অসীমানন্দের অভিযোগ : আমি
হিন্দু বলেই অত্যাচারিত, প্রশ্রয় পাচ্ছে মুসলমানেরা ❑ ২৪

প্রতিবন্ধকতা যেখানে হার মেনেছে ❑ মিতা রায় ❑ ২৭

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের জন্মশতবর্ষে আখর-এর নাট্যনিবেদন
'প্রীতিলতা' ❑ বিকাশ ভট্টাচার্য ❑ ৩১

মুসলমানেরা হিন্দু দলগুলির কাছে 'জোলাতি গোরু' ❑ শিবাজী গুপ্ত ❑ ৩৪

নিয়মিত বিভাগ

এইসময় : ১০ ❑ অন্যরকম : ১৯ ❑ চিঠিপত্র : ২২ ❑ সমাবেশ-সমাচার : ২৮-২৯
❑ শব্দরূপ : ৩২ ❑ চিত্রকথা : ৩৩

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

রাজনৈতিক হানাদারির কবলে
ভগবদ্‌গীতা— পৃঃ ১৪-১৭

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ১৯ সংখ্যা, ২৪ পৌষ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৩, ৯ জানুয়ারি - ২০১২

দাম : ৫ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail :
swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website :
www.eswastika.com

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাদের সহৃদয় পাঠকদের জানাচ্ছি, গত কয়েক মাসে নিউজপ্রিন্টের দাম এবং কাগজ ছাপার আনুষঙ্গিক খরচ যেভাবে ক্রমশ বেড়ে চলেছে, তাতে বর্তমান মূল্যে স্বস্তিকা আপনাদের হাতে দেওয়া দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। এই অবস্থায় নিরুপায় হয়েই আগামী ২৩ জানুয়ারি (৬৪ বর্ষ, ২১ সংখ্যা) সংখ্যা থেকে সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকার দাম ৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭ টাকা এবং বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩২৫ টাকা করতে বাধ্য হচ্ছি। পত্রিকার এই আর্থিক সংকটময় মুহূর্তে পাঠকবর্গের একান্ত সহযোগিতা আমাদের একমাত্র কাম্য। বিগত ৬৪ বছর ধরে আপনাদের সহৃদয় চিত্তের যে প্রেরণা স্বস্তিকা-কে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, তা থেকে আমরা বঞ্চিত হবো না— এই প্রত্যাশা রইল।

—স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : বাঙালির শীত-পার্বন

বাঙালি-র বারো মাসে তেরো পার্বনের ত্রয়োদশ পার্বনটি সম্ভবত শীত-পার্বন। বসন্তের আগমনে ইউরোপ যেমন আনন্দের কলতানে মুখরিত হয়, আমাদের এখানে শীতটাও তেমনই। শীত মানেই মেলা-সম্ভার, পিকনিক, সার্কাস। শীত মানেই খেয়ে সুখ, খাইয়ে সুখ। শীত মানেই পৌষ পার্বন, চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া, বোটানিক্যাল গার্ডেন। লিখেছেন—

নবকুমার ভট্টাচার্য, অর্ণব নাগ।

সঙ্গে থাকছে অন্যান্য আকর্ষণীয় বিষয়।

সম্পাদকীয়

অরাজনৈতিক উত্থানের বছর

দেখিতে দেখিতে বিগত বৎসর ইতিহাস হইয়া গেল। ২০১১ খৃস্টাব্দে আমরা কি পাইলাম আর কি হারাইলাম তাহার হিসাব-নিকাশ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। 'জন-গণ-মন' এর শতবর্ষে দুর্নীতির গোলকধাঁধায় জনগণের মন যখন বিষাদে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল ঠিক সেই সময়েই অধিনায়কের জয় হে ধ্বনিতে জনগণের চৈতন্য উপস্থিত হইল। দেশের ভাগ্যবিধাতা হিসাবে নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া কেন্দ্রের শাসকদল দুর্নীতির পঙ্কিল ফাঁদে আবদ্ধ হওয়ায় দেশের মানুষ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। ২০১১-তে সরকারের গোপন ঝোলা হইতে একের পর এক বহু কঙ্কাল বাহির হইয়াছে। দুর্নীতির ছায়া গভীর হইতে গভীরতর হইয়াছে। দুর্নীতি আমাদের সরকারি ব্যবস্থাকে যে নির্মমভাবে গ্রাস করিয়াছে তাহা আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিয়াছে। একদিকে মূল্যবৃদ্ধি অপরদিকে দুর্নীতি দেশের মানুষকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিলেও বিকল্প উপায় না থাকায় মানুষ অসহায় বোধ করিতেছিল। প্রতিবাদ করিবার ভাষাও মানুষ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। টুজি কেলেঙ্কারি, কমনওয়েলথ গেমস কেলেঙ্কারি প্রভৃতি শাসকদলের নানা কেলেঙ্কারিতে মানুষ ছিল অসহায় দর্শক মাত্র। সরকারের আচার ও আচরণ হইতে ক্রমে মানুষের মনে এই বিশ্বাসটাই দানা বাঁধিতে আরম্ভ করিল যে রাজনীতিবিদরাই দুর্নীতির ধারক বাহক ও পৃষ্ঠপোষক। শাসকদলের একের পর এক মন্ত্রীর কেলেঙ্কারির ঘটনা প্রকাশিত হওয়ায় প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়া উঠে নৈতিক নাগরিক সমাজের। প্রয়োজন হইয়া পড়ে নৈতিক ও মূল্যবোধসম্পন্ন অরাজনৈতিক যোদ্ধাদের। আন্না হাজারে, রামদেব প্রমুখ অনশন আন্দোলনের মাধ্যমে আইনি কাঠামোয় দুর্নীতিকে রোধ করিবার বিষয়টি লইয়া দেশের মানুষকে সচেতন করিয়া তুলিলেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের চূড়ান্ত সদিচ্ছার অভাব, অনুপযুক্ত আইনি কাঠামো এবং বিচারবিভাগের উদাসীনতাই জন্ম দিয়াছে এই আন্দোলনের।

বিগত বৎসরের যাহা সর্বাপেক্ষা যেটা ইতিবাচক দিক তাহা হইতেছে গান্ধীবাদী নেতা আন্না হাজারের লোকপাল নিয়োগের দাবিতে সোচ্চার ভূমিকা গ্রহণ। দুর্নীতি মোকাবিলার জন্য তিনি এই দাবি জানাইয়াছেন। সরকারি ক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে নাগরিক সমাজের অভিযানে তিনি কার্যত নাগরিক সমাজের মুখ হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারই নেতৃত্বে হাজার হাজার যুবক-যুবতী রাস্তায় নামিয়াছেন। দেশে সম্পূর্ণ একটি নূতন, অরাজনৈতিক মুখ সামনে উঠিয়া আসিয়াছে। জনগণ বুঝিতে পারিয়াছে তাহারা সোচ্চার হইলেই তাহাদের কণ্ঠ দাম পাইবে। বস্তুত অরাজনৈতিক কোনও ব্যক্তিত্ব চ্যালেঞ্জ ছুঁড়িয়া দিয়াছে বলিয়াই রাজনৈতিক নেতাদের লোকপাল লইয়া এত টালবাহানা, বিষোদগার।

বিগত বছর অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের উত্থানের বছর। সজ্জন-শক্তির আগাইয়া আসিবার বছর। কেন্দ্রীয় স্তরের মতো পশ্চিমবঙ্গেও অরাজনৈতিক উত্থানের জন্যই চৌত্রিশ বৎসরের সরকারের পরিবর্তন ঘটিয়াছে—এই কথাটিও স্বীকার করিতে হইবে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ, সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ে'র জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিনরাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

—স্বামী বিবেকানন্দ।

মনীষা মুখোপাধ্যায় অন্তর্ধান রহস্যের সি বি আই তদন্ত দাবী

তাপস কুমার দাস, আসানসোল॥ একদা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহের সহ নিয়ামক মনীষা মুখোপাধ্যায় ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একদিন হঠাৎ 'নিখোঁজ' হয়ে গেলেন। শোনা যায়, বামফ্রন্টের এক বিশিষ্ট নেতা তাঁকে 'রক্ষিতা' বানিয়ে রেখেছিলেন। মনীষা দেবী সিপিএমের নামী-দামী শিক্ষাবিদ নেতাদের বছর বছর লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে পিএইচ ডি ডিগ্রি বিক্রি করার কথা জানতে পেরে যান বলে খবরে প্রকাশ। এও শোনা যায় যে, তাঁদের আয়রন সাইড রোডের ফ্ল্যাটবাড়িটি সিপিএম নেতাদের কুকীর্তির গোপন আখড়ায় পরিণত হয়েছিল।

মনীষা দেবীর অন্তর্ধান প্রসঙ্গে সে সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তদন্তমূলক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। সেসব খবর থেকে জানা যায় যে, সিপিএম ছিলেন তিনি। তাঁর 'নিখোঁজ' হয়ে যাওয়ার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, দলের এক অকৃতদার নেতার সঙ্গে মনীষা দেবীর একটি যৌথ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে এবং মনীষা দেবীর বাড়িতে ওই নেতার নিত্য যাতায়াত ছিল। কিন্তু বামফ্রন্ট আমলে পুলিশি তদন্ত রিপোর্ট অপ্রকাশিতই থেকে গেছে। তবে এই অন্তর্ধান রহস্যে পুলিশের কাছে উঠে এসেছে বেশ কিছু সিপিএম নেতার নাম।

জানা যায়, বামফ্রন্টের অকৃতদার 'বিদ্যাসাগর' (গ্যাং অব ফোর-এর অন্যতম সদস্য) স্রেফ ভয় দেখিয়ে মনীষা দেবীকে 'রক্ষিতা' বানিয়ে রেখেছিলেন। মনীষা দেবী অনেকদিন পর বুঝতে পারেন, ওই বামনেতাদের কাছে তাঁর চাকরিটি হচ্ছে দাবার ঘুঁটি এবং তাঁর আস্তানা আয়রন সাইড রোডের ফ্ল্যাট 'মধুকুঞ্জ' হচ্ছে তাদের নষ্টামির গোপন আসর। এদের অনৈতিক কাজের প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি। একজন অধ্যাপিকা হয়েও সংযমী-কৌশল অবলম্বন না করে ফ্রন্ট সরকার ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ স্পৃহায় মত্ত হয়ে উঠলেন তিনি। কিন্তু হতভাগিনী মনীষা দেবী বুঝতে পারেননি যে, একক বিদ্রোহে প্রত্যাশিত ফল লাভ হবে না। নেতাদের কুকীর্তি ধামাচাপা দিতে একদিন হঠাৎ 'নিখোঁজ' হয়ে গেলেন তিনি।

রাজ্যের তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দা মহলে গত পনেরো বছর ধরে একটি কথাই ঘোরাফেরা করছে যে, 'অন্তঃসত্ত্বা' মনীষা দেবীকে ১৯৯৬ সালেই লোকলজ্জার ভয়ে সিপিএম নেতাদের কুকীর্তি চাপা দিতে পাচার করে দেওয়া হয়েছিল নেপালের মাওবাদীদের ডেরায়। ওখানেই মনীষাদেবী একটি সন্তানের জন্ম দেন। তারপর প্রায় দশ বছর আগে তাঁকে জার্মানিতে স্থানান্তরিত করা হয়। খবরে প্রকাশ, সেদেশে 'টোডি' নামধারী এক বৃহৎ ভারতীয় বস্ত্র বিপণিতে 'সেলস্‌গার্ল' হিসাবে চাকরি করছেন তিনি।

যেদিন মনীষা দেবী ঘর থেকে বেরিয়ে আর ফিরে আসেননি। ঠিক তার পরের দিনই তাঁর মা থানায় এফ আই আর করেন। এফ আই আর-এ উল্লেখ আছে, ওই দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অফিসে যাওয়ার সময় তিনি মাকে বলেছিলেন, 'ফিরতে রাত হয়ে যাবে... আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে পার্টির অফিসে একবার যাব...।' এখবরও বেরিয়েছিল, স্বরাষ্ট্র দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মনীষা দেবীর 'নিখোঁজ' হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য তাঁর বিশ্বস্ত পুলিশ অফিসার নজরুল ইসলামকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৯৮ সালের মাঝামাঝি কলকাতা পুলিশের তদানীন্তন অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার নজরুল ইসলাম মনীষা দেবীর অন্তর্ধান সম্পর্কে একটি রিপোর্ট বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে দিয়েছিলেন। ওই রিপোর্টে তিনি মনীষা মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, 'শি ওয়াজ লাস্ট সিন হোয়াইল কাউন্টিং (কামিং) আউট ফ্রম দ্য রেসিডেন্স অব শ্রী বিমান বোস, এ প্রমিনেন্ট সিপিআই(এম) লিডার...।' ওই সময় এই বিষয়ে বুদ্ধবাবু, অনিলবাবু বা বিমানবাবু কেউই কোনও উচ্চবাচ্য করেননি। আবার মনীষার বিষয়ে নজরুল ইসলাম যে রিপোর্ট জমা দিয়েছিলেন তা অস্বীকারও করেননি।

রাজ্যবাসীর বিশ্বাস, নজরুল ইসলামের তদন্ত রিপোর্টটি জনসমক্ষে প্রকাশিত হলে এই রাজ্যের পার্টি প্রধান বিমান বসুকে আইন-মোতাবেক গ্রেফতার করতে হতো।

পাপ আর পারা চাপা থাকে না। ঘটনার ১৫ বছর পর মা-মাটি-মানুষের সরকার ক্ষমতায় আসতেই রাজ্যপাল এম কে নারায়ণন সোচ্চার হয়েছেন ধামাচাপা পড়া 'নিখোঁজ' রহস্যের সুলুক সন্ধানে। রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পরই ১৮ মে (২০১১) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে এ বিষয়ে বিশদে জানতে চেয়েছেন রাজ্যপাল। ২২ মে উপাচার্য সুরঞ্জন দাস জানান, গত ২০ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে 'সার্ভিস বুক' থেকে মনীষা মুখোপাধ্যায়ের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত ফাইল রাজ্যপালের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। একাধিক সিপিএম নেতার ঘনিষ্ঠ মনীষা দেবীর অন্তর্ধান রহস্য উদ্‌ঘাটনে রাজ্যপালের সরাসরি হস্তক্ষেপে নেতাদের হৃদস্পন্দন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যাতে সংশ্লিষ্ট নেতারা এ বিষয়ে বেফাঁস কিছু না বলে ফেলেন পার্টির তরফে তার নির্দেশ পৌঁছে গেছে তাদের কাছে।

রহস্য চিরকাল রহস্যেই থেকে যাবে তা হতে পারে না। সিপিএমের মুখোশধারী নেতাদের জনসমক্ষে অনাবৃত করার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়েছে। 'ধরাকে সরা জ্ঞান করা' সিপিএমের উদ্ধত নেতাদের কারাগারের অন্তরালে নিক্ষেপের এই তো সময়। এ ব্যাপারে স্মতর্ব্য, রাজস্থানের জয়পুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালের নার্স ভানোয়ারিদেবী গত সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নিখোঁজ হওয়ার এক মাসের মধ্যে তাঁর সন্ধান না পাওয়ায় খবরের কাগজে প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে রাজস্থান হাইকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে (আইনের ভাষার সুয়োমোটো) সিবিআইকে এই রহস্যজনক নিখোঁজ ঘটনার তদন্ত করতে নির্দেশ দেয়। তাহলে মনীষা দেবীর মায়ের দায়ের করা এই এফ আই আরের ভিত্তিতে কলকাতা হাইকোর্ট কেন সি বি আই-কে নির্দেশ দিতে পারে না মনীষা দেবীর অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচনে?

তাই অবিলম্বে কলকাতা হাইকোর্ট বা রাজ্য সরকার ওই 'নিখোঁজ' রহস্যের তদন্তের ব্যবস্থা করে দোষী ব্যক্তিদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করুক। দোষীরা যতই প্রভাবশালী হোন না কেন শাস্তি পেলে বিচার ব্যবস্থার উপর মানুষের যেমন আস্থা বাড়বে তেমনই মনীষা দেবীর মায়ের আত্মা শান্তি পাবে। এখন শুধু দেখার পাপ বাপকে ছাড়ে কিনা।

[সৌজন্যে : কোলফিল্ড টাইমস]

জি এফ সি-র রিপোর্ট

প্রতি বছরই কালো টাকা জমছে বিদেশে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ যে সময় দুর্নীতি নিয়ে সারা দেশজুড়ে তোলপাড় হচ্ছে, রাজনৈতিক থেকে সামাজিক নেতা, কার্যকর্তারা বিদেশে গচ্ছিত কালো টাকা ভারতে ফেরত আনতে বারবার দাবী জানাচ্ছেন, এ ব্যাপারে সাধু-সন্তরাও পিছিয়ে নেই তখন এক বৈশ্বিক সমীক্ষায় যে তথ্য উঠে এসেছে তা এককথায় ভয়াবহ বলা যেতে পারে। ২০০০ থেকে ২০০৯-এর মধ্যে ভারত থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাচারকৃত অর্থের পরিমাণ ১০৪ থেকে ১২৮ বিলিয়ন ডলার। ভারতীয় টাকায় তা পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ কোটি। গড়ে বছরে প্রায় ৪৮ হাজার থেকে ৬৩ হাজার কোটি টাকা।

দেশ থেকে বাইরে যাওয়া টাকার পরিমাণ—২০০০-২০০৯

১. চীন	—	২.৭৪ ট্রিলিয়ন ডলার
২. মেক্সিকো	—	৫০৪ বিলিয়ন ডলার
৩. রাশিয়া	—	৫০১ বিলিয়ন ডলার
৪. সৌদি আরব	—	৩৮০ বিলিয়ন ডলার
৫. মালয়েশিয়া	—	৩৫০ বিলিয়ন ডলার
৬. সংযুক্ত আরব আমীরশাহী	—	২৯৬ বিলিয়ন ডলার
৭. কুয়েত	—	২৭১ বিলিয়ন ডলার
৮. নাইজেরিয়া	—	১৮২ বিলিয়ন ডলার
৯. ভেনিজুয়েলা	—	১৭৯ বিলিয়ন ডলার
১০. কাতার	—	১৭৫ বিলিয়ন ডলার

একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা (ওয়াচ্ ডগ) গ্লোবাল ফাইনানসিয়াল ইন্টিগ্রিটি (জি এফ টি) সারা বিশ্ব থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তার কম্প্যুটারাইজড করে বিবরণ প্রকাশ করেছে। এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি আগাম সম্ভাব্য রিপোর্টও তৈরি করেছে বলে জানা গিয়েছে। সংস্থাটির মতে এই দুর্নীতির দুটো দিক আছে। প্রথমত, বিদেশ থেকে ধার হিসেবে এবং সোজাসুজি যে টাকা এদেশে লগ্নি (এফ ডি আই) হয় তা থেকে বাইরে যায়। সরকারি পরিসংখ্যান মতে যে পরিমাণ অর্থ আসে তার অনেকটাই কাজে লাগানো হয় না। সেক্ষেত্রে অবশ্যই বাইরে চালান হয়ে যায়। আবার প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি নিয়ে আসা হয়। তাকে 'ইনফ্লো' বলা যেতে পারে। এভাবে গত দশবছরে দেশের ৩৩,০০০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। বেশি রপ্তানি করে কম দেখিয়ে বাদবাকী টাকাটা বিদেশেই গচ্ছিত রাখা হয়। এখানেও ওই একই পদ্ধতিতে 'ইনফ্লো'-'আউটফ্লো'-র ঘটনা ঘটে চলেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ক পরিসংখ্যান-এ থেকে এটা নজরে এসেছে।

এই ভোজবাজির ফলে ব্যাপক পরিমাণে কালো টাকা বিদেশে চালান হয়ে যাচ্ছে—১২১.৬৫ বিলিয়ন (৫.৮ লক্ষ কোটি টাকা)। প্রায় ৯৫ শতাংশ টাকাই এই পদ্ধতিতে বহির্ভারতে চালান হচ্ছে। অদ্ভুত এক গোলচক্কর কাটা চলছে। একইরকম পদ্ধতি চীনের মতো ভারতেও অবৈধ পথে কালো টাকা দেশের বাইরে যাচ্ছে আর ওখান থেকে আবার বৈধ হয়ে দেশে ঢুকছে।

চীন এই তালিকায় এক নম্বরে উঠে এসেছে। ২০০০ থেকে ২০০৯ এর মধ্যে ২.৭৪ ট্রিলিয়ন ডলার। অন্যান্য দেশের মধ্যে আছে মেক্সিকো, রাশিয়া, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া এবং সংযুক্ত আরব আমীরশাহী।

হিংসা কমলেও জেহাদি-গোষ্ঠীরা সক্রিয়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বছর শেষে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করে নিলেন যে গত একবছরে দেশে হিংসাত্মক ঘটনা কমলেও জেহাদিদের নেটওয়ার্ক কিন্তু অটুট। এই প্রসঙ্গে গত ১৩ জুলাই তিনি মুম্বাই এবং দিল্লীতে সন্ত্রাসী হামলা তথা বিস্ফোরণের ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, এদেশে জেহাদিদের মডিউল বা পরিচালন ব্যবস্থা বহাল তবিয়তে বর্তমান। যদিও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরম্ বিগত বছরকে সন্তোষজনক বলে আখ্যা দিয়েছেন। ২০১১-তে জম্মু- কাশ্মীরে হিংসার ঘটনা গত ২১ বছরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম। ৩১ জন নাগরিক এবং ৩৩ জন নিরাপত্তারক্ষী গত বছরে প্রাণ হারিয়েছেন। ২০১০-এ ওই সংখ্যাটা ছিল ৪৭ এবং ৬৯ জন। তাছাড়া বিগত ২৩ বছরের মধ্যে এইবারই জম্মু-কাশ্মীরে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জম্মু-কাশ্মীরের পুলিশপ্রধান কুলদীপ খোডা অবশ্য বলেছেন, ''গত বছর সন্ত্রাসবাদী ঘটনার সংখ্যা ১৯০টি। ১৯৯৫ সালে সবচেয়ে উপদ্রুত অবস্থায় এরকম ঘটনার সংখ্যা ৫,৯৪৬টি ছিল। জম্মু এলাকায় ৭৪ শতাংশ এবং কাশ্মীর উপত্যকায় ৩৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।''

অসমের উলফা'কে বাদ দিলেও এবছর দার্জিলিং-এর গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা এবং অসমের কার্বি জনজাতিদের সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ইউ পি ডি এস-এর সঙ্গেও ত্রিপাক্ষিক শান্তি বা যুদ্ধবিরতি চুক্তি এবছরই হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গত বছর (২০১১) ৬৯ জন নাগরিক এবং ৩২ জন নিরাপত্তারক্ষী নিহত হয়েছে। ২০১০-এ ৯৪ জন নাগরিক এবং ২০ জন নিরাপত্তাকর্মী নিহত হয়েছিলেন।

নকশাল উপদ্রুত এলাকায় ২০১১ সালে ৪৪৭ জন নাগরিক এবং ১৪২ জন নিরাপত্তারক্ষী বিভিন্ন হিংসাত্মক ঘটনায় নিহত হয়েছেন। গত বছর নিহতের সংখ্যা ছিল—নাগরিক ৭১৮ এবং নিরাপত্তাকর্মী ২৮৫ জন। চিদাম্বরম্ স্বীকার করে নিয়েছেন, দেশের ভিতরেই জেহাদি সন্ত্রাসবাদীদের মদতদাতা বা গোষ্ঠী এখনও সক্রিয়।

দুর্নীতি উচ্ছেদের প্রধান অস্ত্র ‘জনমত’ আইন সহায়ক মাত্র

লোকপাল বিল নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্ক চলছে। একই সঙ্গে চলছে রাজনৈতিক দলের মধ্যে দোষারোপের তরজা। কিন্তু কেউ জানতে বা জানাতে চাইছে না দেশের সাধারণ মানুষ কী ভাবছেন। তাঁরা কী চাইছেন। রাজ্যসভায় লোকপাল বিলের উপর ভোটাভুটির আগেই সভা মুলতুবি হয়ে যায়। কারণ, কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস জোট নেতৃত্ব জানতেন ভোটাভুটিতে বিলটি পাশ করানো যাবে না। লোকপাল বিলটি সংসদের ঠাণ্ডা ঘরে পাঠানোর জন্য কংগ্রেস বিজেপিকে দুষছে। এ সবই লোকদেখানো সস্তার রাজনীতি। বাস্তব হচ্ছে, ভারতের কোনও রাজনৈতিক দলই দুর্নীতির ঊর্ধ্বে নয়। তাই স্বাধীন, স্বশাসিত, ‘লোকপাল’ নিরপেক্ষভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে নজরদারি করুক এমন আইন কেউ চায় না। প্রকাশ্যে সে কথা স্বীকার করতে অসুবিধা আছে বলেই সংসদে এহেন লোকপাল নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। দেশের মানুষকে রঙ্গ-তামাশা দেখতে বাধ্য করা হয়েছিল।

তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক যে সংসদের উভয়কক্ষেই কংগ্রেসের লোকপাল বিল অনুমোদিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই লোকপাল সংস্থা বিধিসম্মতভাবে গঠিতও হয়েছে। তারপর? দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইটা কীভাবে হবে। স্বাধীনভাবে দুর্নীতির তদন্ত করার অধিকার নেই লোকপালের। শাস্তি দেওয়ার অধিকার নেই। শাস্তি দিলেও তার বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়া যেতে পারে। সেই মামলা চলবে কয়েক যুগ। সরকারি প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত কেন্দ্রীয় কর্মীদেরই সাধারণভাবে লোকপালের দুর্নীতি দমনের আওতায় আনা হয়েছে। কেউ অস্বীকার করবেন না যে সরকারি প্রশাসনের উপর থেকে নিচুতলা পর্যন্ত দুর্নীতি চলে। টাকা না খাওয়ালে কাজ হয় না। প্রশাসনের ওই দুর্নীতিরোধে কেন্দ্র ও রাজ্যে ভিজিলেন্স কমিশন নজরদারি চালায়। দোষী কর্মীকে শাস্তি দেয়। ভিজিলেন্স কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে সংসদে এবং রাজ্য বিধানসভায় পেশ করা হয়। প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে বিগত বছরে কমিশন সরকারি কর্মীদের কতজনকে দুর্নীতির দায়ে শাস্তি দিয়েছে। কমিশন তদন্ত করে নিজস্ব সূত্রে। গোপনে। অভিযুক্তকে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া

গূঢ়পুরুষের

কলম

হয় আত্মপক্ষ সমর্থনে। প্রণববাবুরা কেন স্বীকার করছেন না যে এতকাল যে কাজটি কেন্দ্র ও রাজ্যে ভিজিলেন্স কমিশন করেছে বা করছে সেই একই দায়িত্ব পালন করবে লোকপাল। সেক্ষেত্রে ভিজিলেন্স কমিশনের ভবিষ্যৎ কি হবে? সংসদে এই নিয়ে কেউ একটি কথাও বলেননি।

ভারতে আর্থিক দুর্নীতির উৎস একমাত্র সরকারি প্রশাসন এবং সরকারি সংস্থাগুলি এটা মানতে পারছি না। এখানে ঘুষের কারবার চলে ঠিকই। কিন্তু কালো টাকার পাহাড় বানানো হয় তা’ সত্য নয়। কালো টাকার প্রধান উৎস বেসরকারি বাণিজ্যিক সংস্থা। ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলই বাণিজ্যিক সংস্থাদের কাছ থেকে তাদের দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত কালো টাকার একটা অংশ চাঁদা হিসাবে নিয়মিত নেয়। কারণ আমরা জানি নির্বাচন কমিশনের বেঁধে দেওয়া বৈধ খরচের বাইরে অনেক বেশি টাকা খরচ করে রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা। সব জেনেও না জানার ভান করি। কালো টাকা খরচ করে বিপুল প্রচারের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করি না। চুপচাপ ভোট দিয়ে প্রার্থীদের জিতিয়ে দিই। নিজেকে নিজেই প্রবোধ দিই, ‘আমার করার কী আছে। সব প্রার্থীই কালো টাকার থলি নিয়ে ভোট কিনতে এসেছে। ঠগ বাছতে গেলে ভোটই দেওয়া যাবে না।’ যেহেতু সাধারণ মানুষের দানে ভারতের একটিও রাজনৈতিক দল চলে না, তাই কড়া ‘লোকপাল’ গঠিত হোক কেউই চায় না। আবার তর্কের খাতিরে ধরে নিচ্ছি, আন্না হাজারের দাবির কাছে নতিস্বীকার করে কেন্দ্রীয় সরকার কড়া লোকপাল গঠন করেছে। তাতে কি হলো? সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতির ঘুণপোকা দূর করার সাংবিধানিক অধিকার লোকপালের থাকছে না। হ্যাঁ, আন্না হাজারের প্রস্তাবিত লোকপাল বিলেও বেসরকারি সংস্থাগুলির দুর্নীতি দমনের অধিকার দেওয়া হয়নি। সমাজের সর্বস্তর থেকে দুর্নীতির মূলচ্ছেদ করার কথাও বলা নেই আন্নার লোকপাল বিলে। তাই প্রশ্ন উঠছে আন্নার আন্দোলনকে ঘিরেও। টিম আন্নার সদস্যদের নিয়ে। ব্যক্তিগতভাবে আন্না- মনমোহনরা সৎ, সজ্জন, নীতিনিষ্ঠ ব্যক্তি। আমাদের সমাজে এমন বহু মানুষ আছেন যাঁরা ব্যক্তি জীবনে সৎ ও আদর্শবাদী। কিন্তু এইসব সৎ সজ্জন মানুষের উপস্থিতি সত্ত্বেও সমাজে দুর্নীতি বাড়ছে সে কথা অস্বীকার করি কীভাবে। রাজনৈতিক নেত্রী হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সৎ ও পরিচ্ছন্ন। কিন্তু ওই কথা তাঁর দলের অন্যান্য নেতা কর্মীদের সম্পর্কে বলা যাবে কি? মুম্বাইতে আন্নার অনশন সত্যাগ্রহে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি তেমন ছিল না। টিম আন্নার ঘোষণা ছিল প্রতিদিন এক লক্ষ মানুষ ধরণা মঞ্চের সামনে জমায়েত হবেন। বাস্তবে তিন-চার হাজার মানুষ এসেছিলেন। মনে হয়, সাধারণ মানুষের মনে সংশয় দেখা দিয়েছে দেশ থেকে দুর্নীতি দূর করা আদৌ যাবে কিনা তা নিয়ে। ভয়টা এখানেই। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে পারস্পরিক বিশ্বাসের উপর। দেশ থেকে, সমাজ থেকে দুর্নীতি উচ্ছেদের প্রধান শক্তিশালী অস্ত্র হচ্ছে ‘জনমত’। প্রবল জনমতের ঢেউ একদিন দুর্নীতিবাজদের খতম করবে এই বিশ্বাস প্রতিটি মানুষের মনে রাখতেই হবে। রাখলে লোকপাল ছাড়াই ভারতীয় সমাজ দুর্নীতি মুক্ত হবেই।

সম্মুখ সমরে কংগ্রেস-তৃণমূল

নিশাকর সোম

রাজ্যের দুই রাজনৈতিক গোষ্ঠীর অবস্থা সমস্যাদীর্ণ। প্রথমে দেখা যাক তৃণমূল-কংগ্রেস জোটের অবস্থা। তৃণমূল পরিচালিত মমতার মুখ্যমন্ত্রিত্বে রাজ্য-সরকার এক দিশাহীন অবস্থায় চলছে। কোনও দপ্তরের জন্যই নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং ভবিষ্যত কর্মসূচীর রূপরেখা দেখা যাচ্ছে না। রাজ্যের আর্থিক অবস্থা সঙ্গীন বলা যায়। এ অবস্থা যদিও বামফ্রন্ট সরকার সৃষ্ট। কিন্তু ইতিমধ্যে এই অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়েছে। শুধু যে বন্ড বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে তা-ই নয়, কেন্দ্র শিক্ষা উন্নয়নের জন্য যে অর্থ দিয়েছিল তা শিক্ষকদের ডিসেম্বর মাসের বেতন দিতে ব্যয় করা হয়েছে! এই ধরনের কাণ্ড বামফ্রন্ট সরকার কোনও কোনও ক্ষেত্রে করার দরুন তৃণমূল তীব্র সমালোচনা করেছিল। আসলে মুখ্যমন্ত্রী ঘটনা বা অবস্থার পিছনে চলছেন এবং বিভিন্ন প্যাকেজ অর্থ বরাদ্দ ঘোষণা করছেন। এ সম্পর্কে সাম্প্রতিক বিষ মদ খেয়ে নিহতের পরিবারকে লক্ষাধিক টাকার আর্থিক সাহায্য করার ঘোষণায় প্রশ্ন উঠেছে যে অনৈতিক কাজ করে মৃত্যুর জন্য 'শহীদ' হওয়া কি চলে? সাধারণ মানুষ এটা ভালো ভাবে নেয়নি। সাধারণ মানুষজনের মধ্যে এ কথা উঠেছে পরিবহন শ্রমিক কর্মচারীরা যখন যার দোষেই হোক বেতন-পেনশন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তখন বিষ-মদে মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দান কি যথাযথ? এদিকে মুখ্যমন্ত্রী অর্থদপ্তরের অনুমোদন না নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরকে অর্থ ব্যয় করার অধিকার দিয়েছেন। এ রাজ্যের প্রশাসনিক রীতি ছিল— প্রত্যেক দপ্তরের বরাদ্দ অর্থ ব্যয়ের অনুমোদন অর্থ দপ্তর দেবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই আদেশ বলে সরকারি প্রশাসনে এক আর্থিক নৈরাজ্য সৃষ্টি হওয়ার পথ কি খুলে যাচ্ছে না?

এই সঙ্গে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন সাম্প্রতিককালে কোনও কোনও বৈদ্যুতিন চ্যানেলে নিজের মন্ত্রিসভা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর মূল্যায়ন প্রচার করা হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন মন্ত্রীর বিশেষ করে শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও কৃষিমন্ত্রী তথা সিঙুরের বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পর্কে সমালোচনামূলক মন্তব্য বা প্রগ্রেস রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছিল।

এসব দেখেশুনে বহুদিন আগে ডাঃ বিধান রায় মন্ত্রিসভার অজাতশত্রু মৎস্যমন্ত্রী হেমচন্দ্র নস্কর-এর এক মন্তব্য মনে পড়ে যাচ্ছে। হেমদা বলেছিলেন— ''আমরা সব কচ্ছপমন্ত্রী— আমরা রাইটার্সে এলে মুখ্যমন্ত্রী আমাদের উল্টে দেন। আমরা সারাদিন হাত পা নাড়ি আর সময় হলে আমাদের সোজা করে দেওয়া হয়। আমরা গুটিগুটি চলে যাই।'' এই কথাগুলি তখন সংবাদপত্রে প্রকাশ হলে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় হেমবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি এটা বলেছেন কিনা? হেমবাবু বলেছিলেন এটাই বাস্তবসম্মত কথা, তাই তিনি বলেছিলেন। বিধানবাবু হেমদাকে বলেছিলেন, ''তোমার মৎস্য দপ্তরে আমি কোনওদিন কোনও হস্তক্ষেপ করিনি।''

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রীদের মধ্যে সুব্রত মুখার্জির গুরুত্ব বাড়িয়ে দিচ্ছেন। তাঁকে পঞ্চায়েত দপ্তরের দায়িত্ব দিলেন। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর হয়ে ক্ষোভের সঞ্চার এবং (২) কংগ্রেসি বিধায়কদের মধ্যে দল ছাড়ার প্রলোভন দেওয়া। উল্লেখ করা প্রয়োজন, সুব্রত মুখার্জিই মমতাকে রাজনীতিতে এনেছিলেন। অন্যদিকে আবার সুব্রতবাবুকে ''তরমুজ''-ও বলা হয়েছিল!

এদিকে রাজ্যের কংগ্রেস-তৃণমূল জোট-এর মধ্যে তীব্র মনকষাকষি হচ্ছে। এর কারণ— (১) ইন্দিরা আবাসনের নাম পরিবর্তন। (২) কংগ্রেস পরিচালিত পঞ্চায়েত-এর রাজ্য-সরকারি সাহায্য না পাওয়া। (৩) প্রদেশ কংগ্রেসের অভিযোগ—কংগ্রেসিদের তৃণমূল আক্রমণ করছে। (৪) আলু-পাট-ধান চাষিদের দুর্দশা।

মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের সাংসদ এবং জেলা কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী জোট ছাড়া এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস একাই লড়বে— এই কথা ঘোষণা করেছেন। ববি হাকিম অধীরবাবুকে পরোক্ষে 'ক্রিমিন্যাল' বলেছেন। মুর্শিদাবাদের তৃণমূল নেতা বলছেন, কংগ্রেসে সিপিএম-এর হাত শক্ত করছে!

উল্লেখ করা প্রয়োজন, মমতা দেবী যখন কংগ্রেসে ছিলেন তখন তিনি অধীরবাবুকে 'সমাজবিরোধী' আখ্যা দিয়েছিলেন। আর সোমেন মিত্রের সম্বন্ধে বলেছিলেন--- 'কালীপুজোটুজো করে,' অর্থাৎ এর বেশি কিছু নয়। এই সোমেন মিত্রের সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হবার পরই মমতা তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করার পথে যান। বর্তমানে সোমেন মিত্র তৃণমূলের সাংসদ আর তাঁর পত্নী তৃণমূল বিধায়ক।

লোকপাল বিল নিয়ে রাজ্যসভায় বিতর্কের দিনটি সম্পর্কে মমতার বক্তব্য 'কালো দিন'। তৃণমূল নেতা মুকুল রায় বলেছেন, ''কংগ্রেস গণতন্ত্রকে হত্যা করলো''। বামপন্থীরা লোকপাল বিল নিয়ে তৃণমূল এবং কংগ্রেসের এই বিতর্ককে 'গট-আপ' বলেছে। এই বিষয়ে মন্তব্য থেকে বিরত থাকলাম। এতে রাজ্যে কংগ্রেস-তৃণমূল রেষারেষি বাড়বে।

এবার দেখা যাক সিপিএম তথা বামফ্রন্টের অবস্থা। সিপিআই-এর রাজ্য সম্মেলনের সিদ্ধান্ত হলো রাজ্যে বামফ্রন্টের বিপর্যয়ের জন্য দায়ী সিপিএম তথা তাদের পরিচালিত সরকার।

সিপিআই সম্মেলন দাবি তুলেছে— বামফ্রন্টের নেতৃত্ব সম্পর্কে আস্থাহীনতা দেখা যাচ্ছে। বামফ্রন্টের নেতৃত্ব থেকে সিপিএমকে সরতে হবে। কারণ এ-কাজে তারা ব্যর্থ— বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছেন। সিপিআই-এর এ-কথায় আর এস পি এবং ফরওয়ার্ড ব্লক সমর্থন করেছে। আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি ও নকশাল গোষ্ঠীদের নিয়ে জোট বাঁধার দিকে এগোচ্ছে। এটাও সিপিএম-এর উপর চাপ সৃষ্টি করছে।

সিপিএম-এর নেতৃত্বের নির্দেশিকাকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জেলায় জেলায় নিন্দিত, বৃদ্ধ, অশক্তদের পার্টি নেতৃত্বে রাখা হচ্ছে। বস্তুত সিপিএমের সম্মেলনে রাজনৈতিক লড়াই হচ্ছে না, হচ্ছে নেতা হবার লড়াই।

‘দেবতা’র মৃত্যু’

১৯৮৭ সালের ১৭ মে অগণিত ভক্তের প্রার্থনায় ও শ্রদ্ধায় এবং বহুবিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণী মানুষের উপস্থিতিতে দেশের তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি হাওড়া ময়দান সংলগ্ন বঙ্গবাসী মোড়ে দেশবরেণ্য ঋষি শ্রী অরবিন্দের আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন করেন। হাওড়াবাসীর গর্ব দৃষ্টিনন্দন শিল্প সুষমায় মণ্ডিত ওই অরবিন্দ-মূর্তিটির চারিধারে সবুজের সমারোহ আর পুষ্প-শোভিত করে মাদার সেন্টিনারী কমিটির উদ্যোগে তার তত্ত্বাবধান চলছিল। কিন্তু গত ১৭ ডিসেম্বর গভীর রাতে মেট্রো রেল-স্টেশন হওয়ার নামে বুলডোজারের আঘাতে ওই মূর্তিটি উপড়িয়ে গো-ডাউনে চালান করে দেওয়ায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। সেন্টিনারী কমিটি এই ঘটনাকে ‘সমগ্র মানবতার লজ্জা’ হিসেবে ব্যাখ্যা করে একে ‘দেবতার মৃত্যু’ আখ্যায় আখ্যায়িত করেছে।

কুমীর সুমারী

চলতি মাসের ১৫ থেকে ১৮ তারিখে ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অব্ ইন্ডিয়া (ডব্লিউ আই আই)-র সঙ্গে রাজ্য বন-দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে প্রথমবারের জন্য কুমীর-সুমারী হতে যাচ্ছে সুন্দরবনে। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বন বিভাগের আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত ৩১টি টিম কুমীর গণনার কাজ চালাবেন চারদিন ধরে। ওই টিমগুলো ৩ সদস্য দ্বারা গঠিত হবে। এখন শীতকাল, তাই দিনের বেলায় কুমীর সুমারীর কাজ চলবে বলে জানানো হয়েছে। প্রায় ১০ লক্ষ টাকা এর জন্য ধার্য করা হয়েছে।

মুসলিম তোষণে

মুসলিম তোষণের ক্রমশ দীর্ঘায়িত তালিকায় নবতম সংযোজন মহারাষ্ট্র মন্ত্রিসভার গত বছরের ২৮ ডিসেম্বরের সিদ্ধান্ত। মহারাষ্ট্রের রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনকে শক্তিশালী করতে আইনী ক্ষমতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল মন্ত্রিসভা। রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী মহম্মদ আরিফ নাসিম খান বলেছেন, কমিশনকে যে আইনী ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে, তাতে করে অভিযুক্ত অফিসারদের বিরুদ্ধে সমন জারির ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে এবং ‘ডকুমেন্টারি এভিডেন্স’-এর জন্য সরকারি কাগজপত্র যখন দরকার তখন দেখার ক্ষমতা থাকবে কমিশনের। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের আশঙ্কা, ‘টার্গেটেড অ্যান্ড কম্যুনাল ভায়োলেন্স বিল, ২০১১’-র প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে মহারাষ্ট্র সরকার রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনকে শক্তিশালী করতে তাদের আইনী ক্ষমতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল।

মাদ্রাসা তহবিল কাণ্ড

মাদ্রাসা তহবিল নিয়ে এর আগে এত ন্যক্কারজনক ঘটনা জিন্দেগিতে হয়েছে কিনা সন্দেহ। কেন্দ্র সম্প্রতি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের আওতায় মাদ্রাসার জন্য অনুমোদিত তহবিল তছরূপ ও অনিয়মের ব্যাপারে জম্মু-কাশ্মীর সরকারকে তদন্ত ও সে বিষয়ে রিপোর্ট পাঠাতে বলেছে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, জম্মু-কাশ্মীরের মাদ্রাসাগুলি কোনও কেন্দ্রীয় সরকারি সাহায্য কখনও চায়নি এবং নেয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন্দ্র কেন যেচে সে রাজ্যের মাদ্রাসা তহবিলে অনুদান করতে গেল আর তার তদন্ত-ই বা এখন চাইছে কেন তা বোধগম্য নয়।

ইসলামি রোষে ক্রিসমাস

হঠাৎ-ই উত্তপ্ত কায়রো। উপলক্ষ ইসলাম ভার্সেস খৃস্টান। ২৫ ডিসেম্বর নির্বিঘ্নে পার হয়ে গেলেও এবং কায়রোতে কয়েক জায়গায় ক্রিসমাস পালিত হবার পর একটি কট্টর মিশরীয় ইসলামিক গোষ্ঠী ফতোয়া জারি করে বলেছে, ক্রিসমাসে খৃস্টানদের শুভেচ্ছা জানানো ‘আমাদের (মুসলমানদের) বিশ্বাসের বিরোধী।’ গত ২৮ ডিসেম্বর ওই মিশরীয় ইসলামিক গোষ্ঠী আল নৌরের তরফে নাদার বাকার এই মর্মে তাদের অবস্থান জানানোর পাশাপাশি জানিয়ে দেন যে মুসলমানরা শুধুমাত্র খৃস্টানদের ‘ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে’ তাদের শুভেচ্ছা জানাতে পারে। প্রসঙ্গত, মিশরে কঠোর ইসলামী বিধি বলবৎ করতে বহুবিতর্কিত সালাফি আন্দোলনের সম্মুখ সারিতে ছিল এই আল-নৌর দলটি।

লন্ডনে ঘৃণা অপরাধ

গত ২৬ ডিসেম্বর লন্ডনে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন ভারতীয় অনুজ বিদভে। ঘটনার তদন্তে নেমে জনা চারেক ব্যক্তিকে ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করার পর লন্ডন পুলিশ জানিয়ে দেয় আততায়ীরা ‘ঘৃণার দ্বারা পরিচালিত’ (মোটিভেটেড বাই হেট) হয়ে অনুজ-কে হত্যা করে। যদিও লন্ডন পুলিশ একই সঙ্গে জানায় এনিয়ে তাদের হাতে ‘উপযুক্ত প্রমাণ’ নেই। লন্ডন পুলিশের হাতে প্রমাণ থাকুক আর নাই থাকুক, ভারতীয়দের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের অনেক দেশেই জাতিগত বিদ্বেষ নতুন কিছু নয়। অস্ট্রেলিয়ার ঘটনার পর এবার ইংল্যান্ড। সব মিলিয়ে নিরাপত্তার অভাবটাই প্রকট হচ্ছে ইউরোপ এবং অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের কাছে।

বাংলা ১০০-য় ১৯

কেন্দ্রীয় গ্রামীণ রোজগার যোজনা প্রকল্পে বছরে ১০০ দিনের কাজের মধ্যে মাত্র ১৯ দিনের বেশি কাজ দিতে ব্যর্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ২০১১-র এপ্রিল থেকে ২০১১-র ডিসেম্বর পর্যন্ত ছ'মাসে ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিমের তথ্যানুযায়ী তৃণমূল সরকারের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ গত ছ'মাসে গড়ে মাত্র ১৩.৩৯ শতাংশ কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করে সবার পেছনে রয়েছে। এ বিষয়ে সবার ওপর রয়েছে বামশাসিত ত্রিপুরা (৪৭.৪৭ শতাংশ)। সব মিলিয়ে সামগ্রিক চিত্রটা যথেষ্টই হতাশাজনক। কারণ বছরে ৩৬৫ দিনের মধ্যে ১০০ দিনের কাজের কর্মসূচী-ই যেখানে কর্মসংস্থানের চাহিদা মেটাতে অনেকাংশে ব্যর্থ, তার ওপরে এই কর্মসূচীর এহেন শোচনীয় পরিণতি কর্মসংস্থানের চাহিদাকে যে আরও সংকটাপন্ন করে তুলবে তা বলাই বাহুল্য।

বেদ, বিবেক ও বর্তমানের মধ্যে সমন্বয়ের সাধক বিবেকানন্দ

ডঃ স্বরূপ ঘোষ

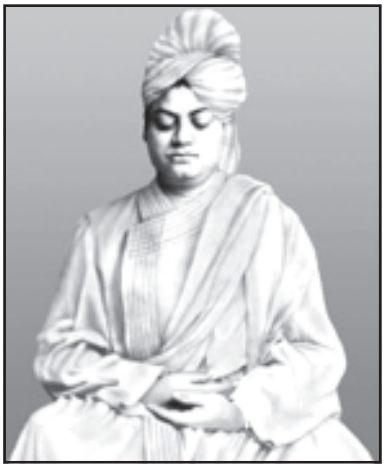

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মসার্ধশতবর্ষে পদার্পণের শুভ মুহূর্তে প্রকাশিত।

স্বামীজীর ভারতবর্ষ সম্পর্কে চিন্তা পরাধীন দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তাঁর আদর্শের মূল ভিত্তি ছিল ভারতবর্ষের সনাতন চিন্তা। অদ্বৈত বেদান্তের দর্শনে আলোকিত ছিল তাঁর অর্থনৈতিক ভাবনা। আমরা যখন সমসাময়িক অর্থনৈতিক চিন্তাবিদদের দর্শনের সঙ্গে স্বামীজীর অর্থনীতি সম্পর্কে ধ্যানধারণাগুলি তুলনামূলক আলোচনা করি তখনই আমরা তাঁর ভাবনার সারবত্তাটি ক্রমশ অনুধাবন করতে পারি। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাত ধরে ভারতবর্ষে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর সঙ্গে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি সমন্বিত রূপ দেখতে পাই। সে পথ ধরেই ভারতবর্ষের ভূমি সংক্রান্ত সনাতন চিন্তাভাবনার আমূল পরিবর্তন আসে। ভূমি মা— মায়ের মতো। তাকে বিক্রি করতে হিন্দুর চিরাচরিত কুণ্ঠা থেকে বেরিয়ে এসে জমি বিক্রি ও হস্তান্তর যোগ্য বলে গণ্য হয়। এই পরিবর্তন ভারতবর্ষের সমাজ জীবনের অন্তর্নিহিত রূপটিকেই বদলে দেয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে সরকার কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে মন দিলে খাদ্যশস্যের ফলন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সবুজ বিপ্লব দেশের সব প্রান্তে একইরকমভাবে প্রয়োগ না হবার ফলে বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। যদিও বামপন্থীশক্তি দাবী করেন যে তাঁরাই গরীব খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার নিয়ে চিন্তিত। দক্ষিণপন্থীরা ধনীর স্বার্থ রক্ষাকারী। হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ কিন্তু বঞ্চিত নিপীড়িত সমাজ নিয়েই বেশি চিন্তিত ছিলেন। রাষ্ট্রবাদী দক্ষিণপন্থা নয়। সব দর্শনের পরিণতি বাম-দক্ষিণে বিভক্ত নয়।

অর্থনীতির সাধনাকে তিনি নীতির ঊর্ধ্বে ভাবেননি। দর্শনের ছাত্র ছিলেন বিবেকানন্দ, তাই বেদান্ত দর্শনের আলোকে তিনি দেখেছিলেন অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভবিষ্যৎ। আমরা পশ্চিমের স্বার্থপরতায় ভরপুর অর্থনীতির পাঠে নিজেদের মোহিত করেছি, তাই দুর্নীতিসর্বস্ব এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আমাদের গ্রাস করে নিয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের সাধনার মূলে 'ছিল অর্থের প্রাচুর্য নয়, মাধুর্যকে অনুধাবন করার শিক্ষা। অল্পে সন্তুষ্ট থেকে অনন্তে মনোনিবেশ করা।' সকলের ভালো থাকার মধ্যেই যে নিজের সুখ ও শান্তি সে সত্য উপলব্ধির শিক্ষাই ছিল স্বামীজীর। পশ্চিমপন্থী ভারতীয় সাহেবরা এই হিন্দু সনাতন সাধনার অঙ্গ হতে চাননি আর নিরীশ্বরবাদীরা তো রাষ্ট্রবাদকেও দক্ষিণপন্থার দুর্নাম দিয়ে ব্রাত্য ভেবে দূরে সরিয়ে দিয়ে লাগাতার তার বিরোধিতাই করে গেছেন। সমাজ তাঁদের কাছে দুই ভাগে বিভক্ত ধনী ও দরিদ্র। বিত্ত নির্ভর প্রভাবশালী মধ্যবর্গকে সেখানে কাঙ্ক্ষিত গুরুত্বই দেওয়া হয়নি। প্রযুক্তির বর্তমান উন্নতির কথা অনুভবই করতে পারেননি মার্কস। সমাজের নীতিনির্ধারক ও সমন্বয়ের দিশারী যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাকে অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যায় তাঁর গুরুত্ব লঘু করে দেওয়া হয়েছে বামপন্থী চিন্তা ভাবনায়। কল্যাণময়ী রাষ্ট্রের উদ্ভবের সম্ভাবনাকেও বুঝতে ভুল করেছিলেন মার্ক্সীয় চিন্তাবিদ্‌রা। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোয় মধ্যবিত্তশ্রেণীর অসীম ক্ষমতায়নকে লঘু করে দেখেছিলেন বামপন্থী নিরীশ্বরবাদী শক্তি।

ধর্মের স্নিগ্ধ, শুদ্ধ, শান্ত রূপটি সাধনার দ্বারা বোঝার চেষ্টাও ছিল না বামপন্থী দর্শনে। পাদ্রীদের অত্যাচারই যে ধর্মের একমাত্র শক্তি নয় সে কথা মার্ক্স সাহেব বোঝেননি। পরবর্তীকালে তাঁর অনুসরণকারীরাও বোঝার চেষ্টা করেনি। তাঁর "Dictatorship of the Proletariat"-এর ভয়ানক ও বর্বররূপটি মার্ক্স নিজে দেখলে কী ভাবতেন জানার উপায় নেই। যে বর্বরতার মধ্যে দিয়ে নৃশংসতার প্রেতনৃত্য সভ্যতা দেখেছে একদলীয় কমিউনিস্ট শাসনে দেশে দেশে তার ইতিহাস হৃদয়বিদারক, রাশিয়া থেকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া এই অসভ্যতার নিদর্শন রয়েছে সর্বত্র। দরিদ্রের ত্রাতা হিসাবে এসে কীভাবে গরীবমানুষের ত্রাস হয়ে ওঠা যায় কমিউনিস্টরা তা দেখিয়েছেন কালে কালে। খেটে খাওয়া মানুষের অধিকারের নামে দলের ক্ষমতায়ন ও দল নেতৃত্বের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কেমন ভাবে হয়েছে তার ইতিহাস বহু চর্চিত। কিন্তু সমাজতন্ত্রের যুক্তিপূর্ণ আদর্শগত দিকটি স্বামীজী উপেক্ষা করেননি। বন্টনব্যবস্থার মধ্যে সাম্যের সত্যরূপটি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির গ্রাস থেকে মুক্তির আন্দোলনে এগিয়ে যাবার পথে সমাজতন্ত্রের গুরুত্বকে তিনি লঘু করেননি। কিন্তু সে সত্যটিকে স্বীকার করতে গিয়ে সনাতন ভারতীয় ধর্মদর্শনকে বিসর্জন দেননি। সমাজতন্ত্র যে ধর্ম বর্জিত হলে ভ্রষ্ট হয়ে পড়বে স্বামীজী তা বুঝেছিলেন বহুপূর্বেই। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের তথাকালীন কমিউনিস্ট শাসনের অসম্মানজনক অপসারণ তাঁর অনুভবকেই সত্য প্রমাণিত করে। তাই তাঁর সমাজতান্ত্রিক ভাবনার মূলে ছিল বেদান্ত। ভারতবর্ষকে আদর্শগত বিতর্কের বৃত্তের বাইরে নিয়ে এসে স্বামীজী বেদান্তের দর্শনের সঙ্গে সমন্বয় ঘটালেন সমাজতান্ত্রিক আদর্শের। তাঁর বৈদান্তিক সমাজতন্ত্রের দর্শন ভারতবর্ষের সনাতন ঐতিহ্যের সঙ্গে অধুনা সমাজচেতনাকে একীভূত করে এক অনন্যসুন্দর ভাবাদর্শের রূপায়ন ঘটল শিবকল্প বিবেকানন্দের চিন্তায়।

দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রথম প্রস্তাবক ছিলেন বিবেকানন্দ ভক্ত নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রাণকেন্দ্রে থাকার কথা ছিল নীতি ও স্বচ্ছতা। নিরীশ্বরবাদী ও পশ্চিমপন্থী মানসিকতায় আকৃষ্ট স্বাধীনতা উত্তরকালের নেতৃত্ব প্রশাসনে সত্য, সুন্দর

ও শিবকে প্রতিষ্ঠাতে ব্যর্থ। সর্বোত্তম প্রমাণ হলো বিপুল পরিমাণে বেআইনী ধনসম্পদ লুকিয়ে রাখা হয়েছে বিদেশী বিভিন্ন ব্যাঙ্কে। সুদীর্ঘ সময় কেন্দ্রে যে দল শাসন করেছে ও যে রাজনৈতিক পরিবার সেই শাসনতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছে তাঁরা বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্‌কে কোনওদিনই গুরুত্ব দেয়নি। হিন্দুর অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানে তাঁদের গভীর অরুচি ও পশ্চিমের পদে আত্মনিবেদিত এই শাসককুল ভারতবর্ষের বর্তমান অর্থনৈতিক দৈন্যতার জন্য মূলত দায়ী। কেন্দ্রের শাসকগোষ্ঠী নিজের প্রভাবভুক্ত রাজ্যগুলোকে যেভাবে সাহায্য করেছে লাইসেন্সরাজের যুগে তাতে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট হয়ে উঠেছে। স্বামীজী সর্বতোভাবে 'Distributive Justice' -এর জন্য সচেতন করেছেন নীতিনির্ধারকদের।

ভূমি সংস্কার ও সমবায় আন্দোলন স্বামীজীর দরিদ্র মানুষকে ক্ষমতায়নের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নিরক্ষরতা কিভাবে গ্রামের দুর্বল শ্রেণীর মানুষকে মহাজনের শোষণের স্বীকার করে তুলেছিল স্বামীজী তা দেখেছিলেন। তাই দারিদ্র্যের মোচনে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ। কৃষি ও শিল্পের আধুনিকীকরণের মধ্য দিয়ে বিকাশের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান সম্ভব হবে একথা স্বামীজী তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলেন। দেশের ধনী মানুষের দ্বারা গরীবের শোষণের ভয়ঙ্কর রূপটি দেখেছিলেন পরিব্রাজক বিবেকানন্দ। সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতায় আবিষ্ট, নড়বড়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপীড়িত, অলস আমলাতান্ত্রিক শ্লথতায় আক্রান্ত ভারতীয় সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নের জন্য ত্যাগ ও সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত বেদান্তের শুদ্ধভাবে উদ্ভাসিত দেশসেবকের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন বলেই রামকৃষ্ণ মিশনের মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর মতো বিজ্ঞানের দ্বারা অনুপ্রাণিত মানুষ যাতে শিবজ্ঞানে জীব প্রেমে এগিয়ে আসতে পারেন তার ব্যবস্থা করেই রেখে গেছেন। আমরা সেভাবে এগিয়ে আসতে পারিনি। স্বামীজীর চিন্তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সামাজিক প্রক্রিয়ায় আত্মনিবেদনের মাধ্যমে বেদান্তের দর্শনে আত্মাকে আলোকিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে তার বর্তমান সমস্যা থেকে তখনই উন্মুক্ত করা সম্ভব হবে যখন দারিদ্র্য ও বেকারী এই দুই অভিশাপ থেকে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিকে মুক্ত করা যাবে।

দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন রামরাজ্যের স্বপ্নের পথে প্রথম পদক্ষেপ। বেদান্ত ভাবে আলোকিত দেশসেবক দ্বারা কর্মযোগীর ন্যায় কর্মযজ্ঞের প্রদীপ জ্বালানো পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজন। সামাজিক ন্যায়, অর্থনৈতিক সমবন্টনের সুন্দর স্বপ্নগুলি সার্থক হবে তখনই যখন বিবেকানন্দের কথায় 'man-making' প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হবে। আমরা দেখেছি স্বাধীনতা উত্তরকালে 'man-making' ছাড়া 'nation building' এর জন্য এগিয়ে আসার মধ্যে কী বিরাট ফাঁকি থেকে গেছে। স্বামীজী তাঁর তাপসদীপ্ত জ্ঞাননেত্রে দেখেছিলেন যে বৈদান্তিক শিক্ষাকে কেন্দ্র করে এক সর্বাঙ্গীণ সুন্দর শিক্ষাব্যবস্থা কালের নিয়মেই গড়ে উঠবে, যেখানে বেদ ও বিজ্ঞান উভয়ই শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুশীলন করা হবে। যার ফলে পূর্বের ধী শক্তির সঙ্গে পশ্চিমের বিজ্ঞান সাধনার সিদ্ধি মিলিত হয়ে মানব সভ্যতাকে এক অক্ষয় কীর্তিলোকে উত্তীর্ণ করে দেবে। সেখানে ক্ষুদ্রতা, নীচতা অতিক্রম করে আদর্শ বিশ্ব নাগরিকের স্পন্দন 'man-making' মিশনের সঙ্গে যুক্ত দেশবাসী অনুভব করবে হৃদয়ে। আমাদের শাস্ত্রে রয়েছে— ''যস্মিন্ সর্বানি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ, তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ''— এই মন্ত্রের শিক্ষা আত্মস্থ করলে ভারতবর্ষে শুরু হবে সর্বজাতিক সহযোগিতার নতুন অধ্যায়।

বিবেকানন্দের 'man-making' মিশন এই আদর্শকে সামনে রেখে সমাজে অর্থ চিন্তা ও স্বার্থচিন্তার ফলে সৃষ্ট বিরোধ থেকে উদ্ভাসিত হলাহলকে ঋষিমন্ত্রের অমৃতস্পর্শে সর্বজনীন মিলনক্ষেত্রে পরিণত করে সামাজিক দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়ে ধনী ও দরিদ্রের দূরত্ব কমিয়ে মানবিক দীনতা আর কৃপণতা থেকে অন্তরকে মুক্ত করে উপনিষদের আলোকস্পর্শে চৈতন্যের জাগরণ ঘটাবে। ভারতবর্ষের তপোবনে সভ্যতার উষালগ্নে উপনিষদের ঋষি কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল ''ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধানম্।''— এই আদর্শে স্থিতাধী হয়ে সর্বভূতে শান্ত অদ্বৈত শিবসত্যকে অনুভবের মধ্য দিয়ে জিজ্ঞাসু হৃদয় জাগ্রত হবে। এই প্রেক্ষাপটের উপর দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দের ভাবাদর্শকে পাথেয় করে স্বামীজীর 'man-making' মিশনের সঙ্গে যুক্ত সভ্যবৃন্দ ভারতবর্ষের সনাতন সত্যকে ভিত্তি করে নতুন শিক্ষা পদ্ধতিকে আহ্বান জানাবে ঋক্‌মন্ত্রে। এই বৈদান্তিক শিক্ষায় উদ্ভাসিত হয়ে মানুষ ধনসম্পদের চেয়ে সাধন সম্পদের গুরুত্বকে স্বীকার করে অন্তরের শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে যেদিন সকলকে স্বাগত জানাতে পারবে সেদিনই স্বামীজীর প্রতি সত্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে। পোশাকী আহ্বান নয়, হৃদয়ের স্পর্শে ঋদ্ধির সিদ্ধিতে দীপ্ত হয়ে উঠে বিবেকানন্দ-অনুরাগী মানুষ উপলব্ধি করতে পারবে অন্তরের সত্যকে। আত্মপ্রচারের জন্য নয়, আত্মাকে মুক্ত করার আদর্শে ব্রতী হয়ে তাঁরই সার্ধশতবর্ষে রাষ্ট্রবাদের নবযুগের উদ্বোধনী হোক। তার শুভ শঙ্খধ্বনি আমরা শুনতে পাচ্ছি হৃদয় মন্দিরে।

বিবেকানন্দ মানুষ গড়াকে প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে মনে করতেন। পাঠ মুখস্থ নয়, শিক্ষার আদর্শকে আত্মস্থ করার উপরই ছিল তাঁর দৃষ্টি, কারণ তাহলেই পড়াশুনোর পরে বিদ্যার্থীরা শুধু চাকুরীজীবী হিসাবেই দিনপাত করবে না, তার সঙ্গে কল্যাণকর গঠনমূলক কাজেও অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশ ও জাতির প্রকৃত সেবক হয়ে উঠবে। তাই স্বামীজী বলতেন, দরকার না হলে মানুষের মধ্যে সমাজচেতনা জাগ্রত হবে না। তাই লেকচারভিত্তিক শিক্ষার চেয়ে স্বামীজী গুরুকুল পদ্ধতিতে শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং এই ব্যবস্থাকে মানুষ গড়ার লক্ষ্যে বিশেষ কার্যকর বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে ঋষি-মুনি দ্বারা প্রদর্শিত ভারতবর্ষের প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতি বিদ্যার্থীকে আত্মনির্ভর করে তুলে তাকে অমৃতলোকের সন্ধান দিতে পারবে যার ফলে সে নিষ্কাম কর্মের প্রেরণা পাবে। জন্ম-মৃত্যুর চক্রবৃত্তের মধ্যে আবিষ্ট না থেকে সে বিবেককে বিত্তচিন্তা থেকে বিমুক্ত করে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাকে কাটিয়ে তুলে তার সামাজিক সত্তাকে আবিষ্কার করবে যাতে নীরস শিক্ষায় জীবনের ব্রহ্মচর্য-পর্ব অতিবাহিত হয়ে না যায়। সমগ্র শিক্ষাকালে কতগুলি কথার বোঝা টেনে পরের চিন্তার দাস হয়ে সরস্বতীর প্রকৃত সাধক হওয়া যায় না। সারস্বত সাধনার মূলে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত উচ্চ-ভাবগুলোকে মর্মস্থল থেকে উপলব্ধি করার প্রয়োজনীয়তা। রাষ্ট্রবাদে দীক্ষিত বিবেকানন্দ অনুরাগী দেশসেবকরা স্বামীজীর ভাবাদর্শকে পাথেয় হিসাবে নিয়ে এই চেষ্টায় ব্রতী থাকবে এ আশা বিবেকানন্দের প্রতি আস্থাশীল গৃহী ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সন্ন্যাসী উভয়েরই। পূর্বের ঋষি প্রদত্ত শিক্ষা পশ্চিমের স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যাতে সহজে পৌঁছে যায় তার জন্য বিবেকানন্দ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একাধিক বেদান্ত সোসাইটি কেন্দ্র গঠন করেছিলেন যাতে আমেরিকার উচ্চ শিক্ষিত সম্প্রদায় বৈদিক আলোকে আলোকিত হতে পারেন ও বৈদিক ধর্মের প্রচারকার্যেরত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রবাসী বৈদিক সন্ন্যাসীবৃন্দ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার সুযোগ পান। এই আদান-প্রদানে উভয়ই উপকৃত হয়ে বিশ্বের শিক্ষা জগতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে বলে তিনি মনে করেছিলেন। রাষ্ট্রবাদী শক্তি স্বামীজীর এ আশা পূর্ণ করবে বলে বিশ্বাস রাখি। অন্তরে বেদান্তের ভাব ও অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক ভাবনা এই দিয়ে যে মতবিজ্ঞান সেই বৈদান্তিক সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলা শুরু হলেই ভারতে নব যুগের সূচনা হবে।

গীতা ও কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো

এস এন সাহু

গীতা সর্বকালে শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছে। স্যার এডুইন আর্নল্ড ইংরেজিতে গীতার অনুবাদ করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীও ভীষণভাবে গীতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ভারতের গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস বলেছিলেন, বৃটিশ সাম্রাজ্য

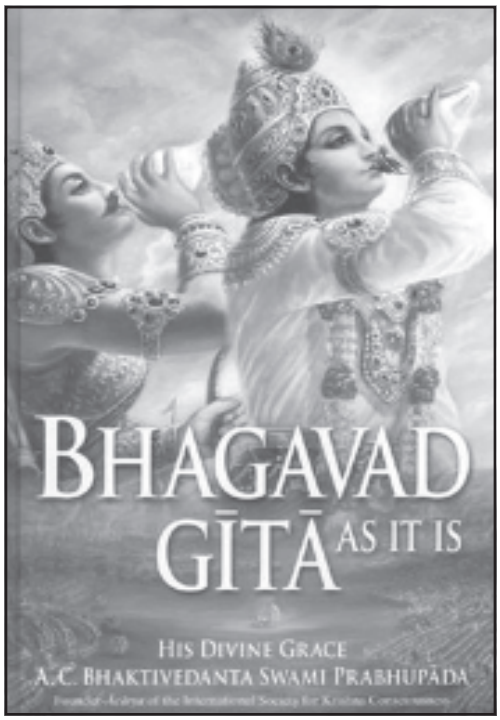

ভবিষ্যতে থাকুক বা না থাকুক, গীতা চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। ম্যানহাট্টান প্রজেক্টের অধিকর্তা রবার্ট ওপেনহাইমার যিনি প্রথম আণবিক বোমার গবেষণা করেছিলেন, ১৯৪৫ সালে তিনি আণবিক বোমার পরীক্ষার সময় গীতা-পাঠে মগ্ন ছিলেন। বোমা বিস্ফোরণ প্রত্যক্ষ করে তিনি গীতার শ্রীকৃষ্ণের বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। বাণীটি এইরকম : আকাশে সহস্র সূর্যের উদ্ভাসিত রশ্মি হলো তাঁর (ঈশ্বরের) স্বরূপ। ওপেনহাইমারের মতে পরমাণু ভেঙে এমনই শক্তি পাওয়া যাবে। সম্প্রতি ই. শ্রীধরণ যিনি দিল্লির মেট্রোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তিনি বলেছিলেন গীতা আমাদের কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। প্রসঙ্গত তিনি মেট্রো রেলের প্রত্যেক কর্মীকে একটি করে গীতাগ্রন্থ উপহার দিয়েছিলেন তাঁদের কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য।

গীতার প্রসঙ্গ টেনে আনার কারণ হলো সাইবেরিয়ার তমস্ক (Tomsk) আদালত গীতা নিষিদ্ধ করতে চলেছে। এই নিয়ে লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্যরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। রাজ্যসভায় জিরো আওয়ারে জনৈক সদস্য প্রসঙ্গটি তুললে ডেপুটি চেয়ারম্যান কে. রহমান খান জানান, গোটা সভা এই বিষয়ে সমস্বরে উদ্বেগ প্রকাশ করছে। একজন সদস্য বলেন, রুশ্ কর্তাদের গীতার মহত্ত্ব অবহিত করা দরকার। তারা জানুক যে শুধু হিন্দু নয়, অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাছেও গীতা শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছে।

একটা কথা— গীতা কিন্তু এই প্রথম নিষিদ্ধ হচ্ছে না। ১৯৭৫ সালে তুরস্ক সরকার গীতা নিষিদ্ধ করেছিল। যখন গীতা তুরস্কে নিষিদ্ধ হতে যাচ্ছিল তখন কে. আর. নারায়ণন যিনি পরবর্তীকালে ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন তিনি সদ্য সেদেশের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সেই সময় এদেশের লোকেরা সেদেশে গীতা নিষিদ্ধকরণের বিষয়টি অবহিত করার কথা বলেন।

কে আর নারায়ণন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রদূতের কর্মভার গ্রহণ করে তুরস্কের গীতা নিষিদ্ধকরণের প্রসঙ্গটি তোলেন। তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে তাঁকে আশ্বাস দেন।

নারায়ণ এই আশ্বাস পেয়ে ক্ষান্ত হননি। তিনি তুরস্কের পররাষ্ট্র দপ্তরের পদস্থ কর্তাদের গীতার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার জন্য অনবরত চাপ দিতে থাকেন। অবশেষে তাঁকে জানানো হয় যে কম্যুনিস্টদের অফিসে পুলিশি অভিযান

অতিথি কলম

এস এন সাহু

চালানোর সময় গীতা ও কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো তাঁদের হাতে আসে। তাঁরা মনে করছিলেন কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোর মতো গীতাও বিপ্লবের প্রেরণা দেয়। সেইজন্য তাঁরা এই দুটি গ্রন্থই নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

নারায়ণন বোঝালেন তাঁদের এই ধারণা ভুল। গীতা ঐক্য ও সহনশীলতার কথা বলেছে, মানবজাতিকে শিখিয়েছে যে, ঈশ্বরত্ব অর্জন করা যাবে সাধু- সন্ত কথিত নানা পন্থা অবলম্বন করে। তিনি আরও জানান, কম্যুনিস্ট যারা ধর্মকে আফিম বলে মনে করে তারা গীতাকে কখনও গ্রহণ করতে পারে না। শ্রী নারায়ণন তুরস্কের কর্তাদের পরিষ্কার ভাষায় বলেন— গীতা কখনোই কোনও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়। এই মহাগ্রন্থ আধ্যাত্মিকতার উৎস। তাঁর চেষ্টা ফলপ্রসূ হলো। গীতার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হলো।

পরবর্তীকালে যখন নারায়ণ এদেশের রাষ্ট্রপতি তখন মুস্তাফা বুলেন্ট এসিভিট তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী হয়ে ভারতে আসেন। তিনি প্রসঙ্গত নারায়ণনকে জানান, যখনই তিনি রাজনৈতিক জীবনে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন, গীতা পাঠ করে তিনি প্রেরণা পেয়েছেন।

রাশিয়ার তমস্ক আদালতে গীতা-বিরোধীদের পশ্চাদ্‌পসরণ

কুড়ি বছর বাদে হঠাৎ গীতা নিয়ে গণ্ডগোল কেন?

বাসুদেব পাল ॥ রাশিয়াতে গীতার অনুশীলন পঠন-পাঠন বেশ পুরনো। তাও প্রায় ২০০ বছরেরও বেশী। কে জি বি-কম্যুনিস্ট শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট রাশিয়াবাসী প্রকাশ্যে ধর্মাচরণ বা শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার অনুসরণ বা অনুশীলন করার সুযোগ পায়নি। তবে গোপনে তা ভালোই হোত বলেই পরবর্তীকালে জানা গিয়েছে। শেষপর্যন্ত নিষিদ্ধ করা না গেলেও সম্প্রতি সাইবেরিয়ার আদালতে 'শ্রীশ্রী গীতা' নিষিদ্ধ করার মামলা পৃথিবীজুড়ে হৈচৈ ফেলে দিয়েছে। রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘ।

ভগবদ্‌গীতার রাশিয়ান ভাষায় প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৮৮ খৃস্টাব্দে। অল্প কিছুদিন বাদেই কালিদাস-এর 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'ও রাশিয়ান ভাষায় অনূদিত হয়। সেটা ছিল ১৭৯২ খৃস্টাব্দ। এরপরই ক্রমশ রাশিয়ার কবি, লেখক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের কাছে ভারতীয় চিরন্তন দর্শন-সাহিত্য-কাব্য জনপ্রিয়তা লাভ করে। রাশিয়ান কবি এ এস পুশকিন-এর আগ্রহে লিও টলস্টয়ও রামায়ণ ও গীতার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে সাইবেরিয়ার শহর তোমস্ক-এর আদালতে গীতা'র নিষিদ্ধকরণের দাবী বিপরীত এবং হতাশাব্যঞ্জক বৈকি! এটা গোটা রাশিয়ার মনোভাব— তা আদৌ নয়। যার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তোমস্ক আদালতেই গত বছরের ২৮ ডিসেম্বর সেই অত্যন্ত আপত্তিকর দাবি সসম্মানে নাকচ হয়ে যাওয়া।

কিন্তু প্রশ্ন হলো হঠাৎ এই দাবি উঠলো কেন? সূত্রমতে, এটা আসলে ইসকন (ISKCON) এবং রাশিয়ার স্থানীয় রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে

রাশিয়ায় গীতাপাঠ

মনোমালিন্য এবং মনকষাকষির ব্যাপার। তমস্কের সরকারি উকিল স্থানীয় একটি চার্চের কলকাঠি নাড়াতেই প্রভুপাদ-এর ব্যাখ্যা সম্বলিত ''ভগবদ্‌গীতা, এ্যাজ ইট ইজ'' বইটিকে আদালতে টেনে এনেছেন। এটাকে সেই হিসেবে মূল গীতা বলা যায় না। কুড়ি বছর আগে 'ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট' প্রভুপাদের ভাষ্যসহ ওই শিরোনামে বইটি প্রকাশ করে। যদিও বইটিতে পুরো গীতাটিই রয়েছে। সরকারি উকিল যে ইসকন্ বিরোধী গোষ্ঠীর লোক তা তার উত্থাপিত বিভিন্ন যুক্তিতেই প্রমাণিত। তিনি যে বিশেষজ্ঞের মতামতের ভিত্তিতে অভিযোগ দায়ের করেছেন তাও ওই তমস্ক রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের। গত বছরের ১২, ১৮, ২৯, ৩০ আগস্ট যে শুনানী হয়েছে সেখানে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন অধ্যাপক স্পষ্ট বলেছেন— মতামত তাঁদের ব্যক্তিগত, কোনও সরকারি মতামত নয়। দ্বিতীয়ত, এর আগে ওই বিশেষজ্ঞরা লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা বইটিতে (শ্রীশ্রীগীতা) উগ্র বা উস্কানিমূলক এমন কিছু দেখেননি যে তা নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হতে হবে। আদালতের আমন্ত্রণে দুই উপদেষ্টা এন ভি স্রেবেন্নিকভ এবং এন এন কাপ্রিস্কি বিশেষজ্ঞদের লিখিত অভিমতকে খারিজ করে দিয়েছেন। দুই উপদেষ্টা অবশ্য বলেছেন— প্রভুপাদের কিছু ব্যাখ্যা অবশ্য যাঁরা কৃষ্ণভক্ত নন তাদের ক্ষেত্রে অপমানসূচক। অবশ্য তাঁরা এও বলেছেন যে, বইটিতে গোষ্ঠী বিরোধিতা অথবা ধর্মের ভিত্তিতে কোনও ভেদাভেদ করা হয়নি। এসকল যুক্তির বিপক্ষে জজসাহেবা নিজেই যুক্তি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বাইবেলেও বলা আছে— 'ঘৃণিতের দিকে মুক্তো ছুঁড়ো না'। আদালতের প্রক্রিয়ায়— 'স্বামী প্রভুপাদের বইটির একটি অন্যরকম বৈশিষ্ট্য রয়েছে', এবং অভিযোগের স্বপক্ষে কোনও প্রমাণই নেই। এই ঘটনায় বরং রাশিয়ান সমাজ লজ্জিত। সেখানকার সংবাদমাধ্যম আদালতের ঘটনাকে নিন্দা করেছে। তমস্কের সান্ধ্য দৈনিক 'Vechernyi Tomsk' এক প্রতিবেদনে লিখেছে— 'ভারতীয় গ্রন্থের বিচার লজ্জাকর'। অন্য একটি পত্রিকা— Gazetaru প্রশ্ন তুলেছে '৫০০০ বছর আগের রচনা হঠাৎ করে কীভাবে উগ্রবাদী হয়ে গেল?

এই বিষয়ে সর্বত্র জোরকদমে আলোচনা বিতর্ক হচ্ছে। তমস্কের মানবাধিকারকর্মী নেলি ক্রেচেট্‌ভা এই ঘটনাকে অনুচিত বলেছেন। শ্রীমতী ক্রেচেট্‌ভা আরও বলেছেন, সারা পৃথিবীর এক বিলিয়ন-এর বেশি মানুষের কাছে বইটি পবিত্র। বিগত কুড়ি বছরের বেশি রাশিয়াতেই বইটির প্রচার হয়ে আসছে। অথচ সে কারণে একটিও উগ্রপন্থী ঘটনা ঘটেনি। বইটি নিষিদ্ধ করা হলে তা সাংবিধানিক অধিকার এবং নাগরিকদের মতপ্রকাশ ও বিশ্বাসের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে গণ্য হবে।

গত ২৮ নভেম্বর রাশিয়ার প্রমুখ সংবাদপত্র Moskovsky Komsomolets-এর উদ্যোগে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে রাশিয়ান একাডেমি অফ্ সায়েন্সের বৈজ্ঞানিকরা এবং অনেক ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব যোগ দেন। তাঁরা সেখানে সর্বসম্মতভাবে একটি প্রস্তাবও গ্রহণ করেন। প্রস্তাবে বলা হয়েছে--- ''তমস্কের আদালতে সরকারি উকিল যে মামলা এনেছেন তা সর্বৈব অনুচিত এবং রাশিয়া ও ভারতের বৈষ্ণবদের ধর্মবিশ্বাসের পক্ষে অপমানসূচক।''

সব মিলিয়ে মূল রাশিয়ার সমাজ গীতার বিপক্ষে নয় বলেই তোমস্ক আদালত গীতা নিষিদ্ধকরণের দাবিকে উড়িয়ে দিতে পেরেছে। সুতরাং মেনে নিতে হচ্ছে যে গীতা নিষিদ্ধকরণের দাবি ছিল মূল সমাজের অনভিপ্রেত ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র। তবে দেশে-বিদেশে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে তার ফলে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার চর্চা আরও বাড়বে বলেই মনে হয়।

ভালুকের কবলে ভগবদ্‌গীতা

তথাগত রায়

পড়ে মনে হতে পারে, এ আবার কি অদ্ভুত রচনা? শ্রীমদ্‌ভগবৎগীতা হঠাৎ এত জায়গা থাকতে ভালুকের কবলে যেতে যাবে কেন? কিন্তু আজকের বাস্তব ঠিক তাই— ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী আজ এক ভালুকের কবলে পড়েছে। তাতে অবশ্য গীতার ক্ষতিবৃদ্ধি বিশেষ কিছুই হবে না, খুব বেশী হলে ভালুকের ঘরে গীতা না-ও ঢুকতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা বোঝা দরকার।

এ কোনও সাধারণ ভালুক নয়, এ হচ্ছে রুশ ভালুক। কোনও দেশ, প্রদেশ বা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে অনেক সময় কোনও না কোনও জন্তুজানোয়ারের চেহারা জড়িয়ে যায়, সেটা সবসময় নেতিবাচক নাও হতে পারে। যেমন, বৃটেনের সঙ্গে সিংহ জড়িয়ে আছে (কেন আছে তাঁরাই জানেন), পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাঘ, অসমের সঙ্গে গণ্ডার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান দলের সঙ্গে হাতী, ডেমোক্র্যাটিক দলের সঙ্গে গাধা ইত্যাদি। তেমনি রাশিয়ার সঙ্গে ভালুকের চেহারাটা জড়িয়ে আছে এবং রাশিয়ার উল্লেখ করার সময় 'রুশ ভালুক' কথাটা প্রায়ই এসে পড়ে। এহেন এক ভালুকরূপী রুশ বিচারক, প্রত্যন্ত তোমস্ক শহরে, গীতার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে উদ্যত এবং করলে সমস্ত রাশিয়াতেই তা প্রযোজ্য হবে। বিচারক আসলে অবশ্যই ভালুক নয়, মানুষই, কিন্তু বুদ্ধিটা ভালুকের মতো।

কোথায় এই অশ্রুতপূর্ব তোমস্ক শহর? রাশিয়া দেশটি আকারে বিশাল এবং ইউরোপ ও এশিয়া, এই দুটি মহাদেশকে জড়িয়ে আছে— পশ্চিমে ইউরোপের সেন্ট পিটার্সবার্গ (আগে নাম ছিল লেনিনগ্রাদ, এখন লেনিন আবর্জনায় পরিণত) থেকে পূর্বে এশিয়ার ভ্লাদিভস্তক পর্যন্ত। এর বিস্তার সাড়ে ছয় হাজার কিলোমিটার জুড়ে অর্থাৎ কলকাতা থেকে মুম্বাইয়ের যা দূরত্ব তার প্রায় চার গুণ। দুই মহাদেশের মধ্যে বিভাজন উরাল পর্বতশ্রেণী। এর পূর্বে, অর্থাৎ এশিয়ার অংশে যে রাশিয়া তার নাম সাইবেরিয়া, রুশরা বলে 'সিবির'। এই সাইবেরিয়ার বেশিরভাগই বরফে ঢাকা জনশূন্য প্রান্তর, অথবা 'তুন্দ্রা' অঞ্চল যা শীতকালে বরফে ঢাকা থাকে এবং গ্রীষ্মকালে কাদা হয়ে থাকে। এর মধ্যে জনবসতি বেশিরভাগ দেশের দক্ষিণাংশ

কলকাতায় রাশিয়ান কনস্যুলেটের সামনে শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাখ্যা সম্বলিত 'ভগবদ্‌গীতা যথাযথ' নিয়ে বিক্ষোভরত 'ইসকন'-এর সমর্থকরা।

জুড়ে, যেখান দিয়ে চলে গেছে পৃথিবীর দীর্ঘতম, ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ। এই দক্ষিণাঞ্চলে রেলপথের উপরে তোমস্ক একটি মাঝারি মাপের শহর, লোকসংখ্যা সাড়ে পাঁচ লক্ষ। তাপমাত্রা শীতকালে মাইনাস পঞ্চান্ন পর্যন্ত নেমেছে।

এই তোমস্ক 'অবলাস্ত্' (অঞ্চল) জুড়ে, এবং রাশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলেও বহু মানুষ ইস্কন-এর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। ইস্কন-কে আমরা সবাই চিনি, এঁদের আমরা চলতি কথায় 'হরে কৃষ্ণ'ও বলে থাকি, কারণ পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে এঁরা 'নমস্কার' না বলে বলেন 'হরে কৃষ্ণ'। এঁরা পরম বৈষ্ণব, নিরামিশাষী। মাধুকরী, নগরসংকীর্তন ইত্যাদি করেন। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, যাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল অভয়চরণ দে (এ.সি. হচ্ছে অভয়চরণেরই সংক্ষিপ্তরূপ)। ইনি ১৯৬৫ সালে হঠাৎ 'ডাক' পেয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং একটি মালবাহী জাহাজে করে কপর্দকশূন্য অবস্থায় নিউইয়র্ক শহরে পৌঁছন। কিন্তু তাঁর অচলা ভক্তি ও কৃষ্ণনাম প্রচার বহু মার্কিন যুবক-যুবতীর মনকে নাড়া দেয়। এবং কালক্রমে তাঁরা শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও 'ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ কৃষ্ণ কনশাসনেস' প্রতিষ্ঠা করেন, যার সংক্ষিপ্ত নাম 'ইস্কন'। বর্তমানে এটি একটি বিশালাকার এবং পৃথিবীব্যাপী প্রতিষ্ঠানে পরিণত। এঁরা শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন এবং শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা— বিশেষ করে শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাখ্যাসমেত যে গীতা— তার প্রচার করেন। এঁদের মধ্যে মার্কিনদের আধিক্য বেশি, কিন্তু ভারতীয়, ক্যানাডিয়ান, ইংরেজ, জার্মান, রুশও বহু আছেন। এঁদের মুখ্য কার্যালয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায়, কিন্তু এঁদের সর্বাপেক্ষা পবিত্র তীর্থ গঙ্গাতীরবর্তী কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পদধূলিধন্য মায়াপুর, যেখানে এঁরা এক বিশাল মন্দির বানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, বঙ্গীয় কমরেডরা যেহেতু এঁদের কব্‌জায় আনতে পারেননি সেইজন্য এঁদেরকে সি.আই.এ.-এর গুপ্তচর ইত্যাদি নানা আখ্যায় যথারীতি ভূষিত করে গুজব রটিয়েছেন— বলা বাহুল্য, কোনও প্রমাণ ছাড়াই। এগুলি ডাহা মিথ্যাকথা।

রাশিয়ায় বেশিরভাগ মানুষ খৃস্টান, 'রাশিয়ান অর্থোডক্স' সম্প্রদায়ভুক্ত। কোথাকার

ভারত থেকে এক অদ্ভুত শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম উড়ে এসে জুড়ে বসায় এবং বহু রুশ তরুণ-তরুণী এই ধর্মগ্রহণ করায় এঁরা স্বভাবতই শঙ্কিত। এঁদেরই একটি অংশ তোমস্ক আদালতে এই বলে দরখাস্ত করেছেন যে এই শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক উগ্রপন্থী গ্রন্থ। এবং একে সত্বর নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন। প্রমাণ হিসাবে নিশ্চয়ই একটি গীতার রাশিয়ান তর্জমা পেশ করেছেন, কারণ তোমস্কের বিচারক সংস্কৃত পড়তে পারেন না সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। সেক্ষেত্রে তর্জমার শুদ্ধতা সম্বন্ধে প্রভূত সন্দেহ থেকে যায়, এবং অভিযোগকারীদের মতলব সম্বন্ধে আরও বেশি সন্দেহ থেকে যায়। রাশিয়ার বিচারব্যবস্থা সম্বন্ধে আমার সম্যক ধারণা নেই, কিন্তু যেহেতু তোমস্ক একটি 'অবলাস্ত্' বা অঞ্চল মাত্র, তাই সেখানকার আদালতের রায় চূড়ান্ত না হওয়াই স্বাভাবিক।

তবে যা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে নিন্দার যোগ্য এবং রাশিয়া যাতে এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয় তার জন্য ভারত সরকারের সচেষ্ট হওয়া উচিত।

প্রসঙ্গত, একবার তুরস্কের সরকার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নিষিদ্ধ করেছিল। সে সময় তুরস্কে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন কে. আর. নারায়ণন, যিনি পরে রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। নারায়ণন এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানতে পারলেন যে তুরস্কের সরকার কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিল এবং কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে একখণ্ড গীতা পাওয়ায় অন্য সব কমিউনিস্ট কাগজের সঙ্গে গীতাকেও তারা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। নারায়ণন তাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যালয়ে গীতা পাওয়া গেছে শুনে তিনিও আশ্চর্য, কারণ গীতা একটি ধর্মগ্রন্থ, কমিউনিস্টরা যার বিরোধী। তাঁর চেষ্টার ফলে নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। সৌদি আরবে অবশ্য নিষেধাজ্ঞা আছে— শুধু গীতার উপরই নয়, বাইবেল, গ্রন্থসাহিব, আভেস্তা ইত্যাদি সমস্ত রকম অ-মুসলমান ধর্মগ্রন্থের এবং যে কোন রকম মূর্তির উপর।

ভগবদ্গীতাকে উগ্রপন্থী বলা শুধু মূর্খ এবং উন্মাদের পক্ষেই সম্ভব— তোমস্কের বিচারক এর মধ্যে কোনটা, বা দুটোই, তা অবশ্য আমাদের জানা নেই। ভগবদ্গীতা শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দেওয়া উপদেশ— এ কথাটা আমরা মোটামুটি সবাই জানি, কিন্তু এইসব নয়। এটি একটি আশ্চর্য গূঢ়ার্থসম্পন্ন গ্রন্থ, যা বারবার পড়লে তার থেকে নতুন নতুন অর্থ উন্মোচিত হয়— সেজন্য আজকে এই গ্রন্থ ভারতের হিন্দু থেকে আরম্ভ করে আণবিক বিজ্ঞানের পথিকৃৎ ওপেনহাইমার, মাইক্রোসফ্ট্ সংস্থার পুরোধা বিল গেটস পর্যন্ত সকলের কাছে সমান আদৃত। গীতার অষ্টাদশ (শেষ) অধ্যায়ে একটি শ্লোকে আছে :

''ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া

বিমৃশ্যৈতদশেষেণ শেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু।।

অর্থাৎ এতক্ষণ ধরে আমি তোমাকে গুহ্য থেকে গুহ্যতর জ্ঞান প্রদান করলাম, তারপর তুমি এই সব বিবেচনা করে যা ইচ্ছে তাই কর।

এগুলি কি উগ্রপন্থার কথা?

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হিন্দুধর্মের অগণিত ধর্মগ্রন্থের মধ্যে প্রমুখতম স্থান অধিকার করে আছে— উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্রের সঙ্গে, যেজন্য এই তিনটিকে বলা হয় 'প্রস্থানত্রয়'। এই গীতাকে নিষিদ্ধ করবে তোমস্কের অর্বাচীন বিচারক? ভালুক ছাড়া একে কি বলা যায়?

আমি নিশ্চিত, শেষপর্যন্ত সেরকম কিছু হবে না— কিন্তু ভারত সরকারের এ বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া সত্বর প্রয়োজন।

★

রাশিয়ায় গীতার ওপর আক্রমণ : এক গভীর চক্রান্ত

নটরাজ ভারতী

গীতার উপর আক্রমণ। রাশিয়াতে। হঠাৎ নয়। দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা দীর্ঘদিনের গভীর চক্রান্ত। চাপা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। নিতান্তই নিরীহ হিন্দু ধর্মের মূলে আঘাত। কারণ বাইবেলকে বিনা পয়সায় বিলি করেও টেক্কা দেওয়া যাচ্ছে না গীতার সঙ্গে। বিক্রির বিচারে গীতা এক নম্বর। বিনা পয়সায় বিলি করা বাইবেলের পাঠক সংখ্যার চেয়ে পয়সা দিয়ে কেনা গীতার পাঠক সংখ্যা অনেক বেশী।

বিশ্বের ধর্মজগতের যারা খোঁজখবর রাখেন তারা জানেন— ধর্মীয় প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাইবেল পড়েন না। কোরান ছুঁয়েও দেখে না অন্য ধর্মের মানুষজন। কিন্তু গীতা সর্বজনগ্রাহ্য। দর্শনের বিষয় হিসাবে পড়ানো হয় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিভিন্ন পেশার বিভিন্ন ধর্মের মানুষ গীতার মধ্যে খুঁজছেন জীবনের রহস্য। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালাম থেকে শুরু করে বিশ্বের কোটি কোটি পণ্ডিত ব্যক্তির প্রেরণা গীতা। আর তাতেই বেজায় চটছেন পাদ্রী-মৌলবীরা। কোনওভাবেই বিশ্বজুড়ে আটকানো যাচ্ছে না গীতার অগ্রগতি। তাই গভীর চক্রান্ত। বিশ্বের কোনও এক প্রান্তে আইন করে বন্ধ করতে পারলে বাকি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তেও দাবি তুলতে সুবিধা হবে।

বুঝি আর নাই বুঝি প্রায় প্রত্যেক হিন্দুর বাড়িতে গীতা আছে। বাড়িতে গীতা থাকা সত্ত্বেও ছিল গীতাকে ভারতের জাতীয় গ্রন্থ হিসাবে ঘোষণা করার দাবি তোলা। সে হয়নি কারণ আমরা পড়িনি। ধর্মপুস্তক বলে ঠাকুরের কুলুঙ্গিতে রেখে সিঁদুর গঙ্গাজল আর বেলপাতা চাপিয়েছি। অন্নপ্রাশনের সময় ছেলে বিদ্বান হবে— একবার হাতে গীতা ধরিয়েছি। আর দাদু-ঠাকুমা বাবা-মা মরে গেলে বুকে চাপিয়ে দিয়েছি। সস্তার ১২টি গীতা কিনে ১২ জন ব্রাহ্মণকে দিয়েছি। কেন দিয়েছি জানি না। যে ব্রাহ্মণরা নেন তাঁরাও পড়ে দেখেন না, এর ভিতরে কি আছে তা অন্তত একবার জানা দরকার এটা মনে হয়নি। বাড়ির প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে অন্তত একবার গীতা পড়ানো

কলকাতায় গত ২৬ ডিসেম্বর রাশিয়ায় ভগবৎ গীতা-র প্রস্তাবিত নিষিদ্ধকরণের প্রতিবাদে রাশিয়ান ফেডারেশন অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন।

দরকার। মিশনারি স্কুলে পড়া ছেলেমেয়েরা নিজেদের অজান্তেই বাইবেল পড়ে। শিক্ষিত প্রগতিশীল মুসলমানরাও গর্বের সঙ্গে বলেন— 'জানেন আমার ছেলে ক্লাস নাইনে পড়ে। কিন্তু দু'বার কোরান খতম করেছে।' আমরা বলি না। আমাদের ছেলেরা গীতা পড়লে হতাশায় ভুগবে না। বেঁচে থাকার রসদ পাবে। নতুন করে বাঁচতে শিখবে। কাপুরুষের লক্ষণ এত প্রকট হয়ে উঠবে না। এমন ছাগমার্কা জীবন-যাপন করতে হবে না।

গীতা নিষিদ্ধের দাবি উঠেছে রাশিয়ায়। কেন সুস্পষ্ট কোনও খবর নেই। বাংলা, ইংরাজী, হিন্দী কোনও মিডিয়াতেই পূর্ণ কোনও খবর নেই। সবই ভাসা ভাসা টুকরো টুকরো খবর। তবুও যেটুকু আসছে তা রক্ত গরম করার জন্য যথেষ্ট। আদালতে মামলা চলছে। মূলত দুটি বিষয় নিয়ে। প্রথমত, গীতাতে নাকি অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ আছে এবং দ্বিতীয়ত, গীতাতে যুদ্ধের উন্মাদনা আছে— অনুপ্রেরণা আছে। এসব অভিযোগ এই প্রথম নয়। কলকাতার কিছু বিকৃত বুদ্ধিজীবী বছর চারেক আগেই এই অভিযোগ তুলেছিলেন। এ নিয়ে একটি বই লিখে কলকাতার বাজারে বিক্রীও করেছিলেন। কেউ পাত্তা দেয়নি।

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৫তম শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তি— ''স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্ম ভয়াবহ।'' সরল অর্থ নিজের ধর্মে মরা ভাল কিন্তু অপরের ধর্ম ভয়াবহ। গ্রহণ করা বিপদজনক। এমন নয় যে এ নিয়ে আগে আগে আলোচনা হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে অরবিন্দ সকলেই এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এমনকি বিদেশী পণ্ডিতরাও। এ্যানি বেসান্ত এর ইংরেজী অনুবাদ করেছেন :

"Better death in the discharge at one's
own duty, the duty of another in full of danger."

আরেক বিদেশী আর্নল্ড টয়েনবী এর অনুবাদ করেছেন :

"To die Performing is no ill
But who seeks other roads shall wonder Still."

এই অনুবাদগুলি থেকে স্পষ্ট কোথাও পরধর্ম বিদ্বেষের কোনও গন্ধই নেই। যা আছে তা কর্তব্যের কথা। নিজের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার কথা। সেই সব বিশেষ অজ্ঞ আহাম্মকদের এটাও মনে রাখা উচিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করার

মধ্যে অন্যায় কোথাও নেই। সে সময় শ্রীকৃষ্ণ একথা বলেছিলেন— তখন ইসলাম ধর্ম তো দূরের কথা অস্তিত্ব ছিল না খৃস্ট ধর্মেরও। সুতরাং পরধর্ম বিদ্বেষের গল্প নেহাতই বালখিল্য কষ্টকল্পনা।

বর্তমানকালে ফেরা যাক। সে সময় শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছিলেন তা না মেনে চলার ফল তো আমরা চারপাশেই দেখতে পাচ্ছি। শিক্ষক তাঁর নিজের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। স্কুলে-কলেজে বিশৃঙ্খলা চরমে। চিকিৎসক তাঁর নিজের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়ায় ভেঙে পড়েছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। সরকারি কর্মচারীদের তো কথাই নেই। নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে সচেতন না হওয়ায় দেশজুড়ে এক ফাঁকিবাজ, আড্ডাবাজ এক সুবিধাভোগী শ্রেণীর জন্ম হয়েছে। তার মানে শুধু গীতার এই শ্লোকটুকুর মর্মার্থ বুঝে এবং তা মেনে চললে দেশটা অন্যরকম হতো।

আসা যাক দ্বিতীয় অভিযোগে। যুদ্ধের কথা গীতাতে বহুবার আছে। সেটাই স্বাভাবিক। যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে কথোপকথন। অথচ যুদ্ধ থাকবে না, এটা হতে পারে না। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৭তম শ্লোকে বলা হয়েছে— ''তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়।'' কৃষ্ণ বলছেন— হে অর্জুন যুদ্ধ তোমাকে করতেই হবে। তুমি প্রস্তুত হও। ওই পটভূমিতে এটাই তো স্বাভাবিক। সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা। এখন কোন ছাত্রকে কোনও শিক্ষক কী বলবেন— পড়াশোনার দরকার নেই বাবা। চলো মাঠে গিয়ে খেলা করি। নয়তো সিনেমা দেখিগে। পরীক্ষা যা হয় হবে। এমন শিক্ষক হয় পাগল নয় হতচ্ছাড়া। অলিম্পিক খেলতে গিয়ে কোনও কোচ কি কোনও প্লেয়ারকে বলবেন— প্র্যাকটিসের দরকার নেই। এই দেশটা খুব সুন্দর। চলো বেড়িয়ে আসি। যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন দাঁড়িয়ে। হতাশায় ভুগছে। কি করবে বুঝতে পারছে না। কল কল করে ঘামছে। অঙ্ক প্রশ্ন কঠিন হলে ছেলেমেয়েদের যা হয়। এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ ছাত্র হিসাবে বন্ধু হিসাবে তাকে প্রেরণা দেবে না তো কি বলবে। এই প্রেক্ষিতে--- ওই পটভূমিতে এটাই তো সঠিক আদর্শ বন্ধু ও শিক্ষকের কাজ। এখনও তো সেনাবাহিনীর কর্নেলরা যুদ্ধের সময় সৈনিকদের উদ্বুদ্ধ করেন। সেটাই তো কাজ। এর মধ্যে অন্যায় কোথায়?

আধুনিক ভারতে কিছু বিকৃত বুদ্ধির বুদ্ধিবদ্ধজীবদের বাদ দিলে এমন কেউ আছেন কি যিনি গীতা থেকে প্রাণের রসদ সংগ্রহ করেননি? বঙ্কিমচন্দ্র-অরবিন্দকে বাদই দিন। মাইকেল মধুসূদনকেও শেষ পর্যন্ত গীতাতেই ভরসা রাখতে হয়েছিল বলে মনে হয়। তাঁর কবিতার লাইন— 'জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে—চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন নদে।' গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৭তম শ্লোকের হুবহু অনুবাদ। সেখানে আছে—জাতস্য হি ধ্রুব মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের প্রধান অস্ত্র ছিল গীতা। গীতা না থাকলে দেশটা স্বাধীন হতো কিনা সন্দেহ।

সব থেকে অবাক কাণ্ড রাশিয়ায় গীতার উপর আক্রমণ হচ্ছে শুনেও নীরব এদেশের টিকি তিলকধারী বাবাজীরা। যাঁদের প্রতিবাদে মুখর হওয়ার কথা তাঁরা একেবারে ডাঙায় তোলা শামুকের মতো ঘাপটি মেরে গেছেন। এঁদের গেরুয়া ঝোলাতে শিষ্য করার জন্য যেমন গঙ্গামাটি আর শুকনো তুলসীপাতা থাকে তেমনই একটি জরাজীর্ণ গীতাও থাকে। নিজে কখনও পড়েন না। শিষ্যদের পড়তেও বলেন না। অহোরাত্র কৃষ্ণনাম নিয়ে থাকা এঁরা কৃষ্ণের কলঙ্ক। কৃষ্ণ নামের কলঙ্ক। এর মধ্যে কয়েকজন বাবাজীর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টাও করেছিলাম। কৃষ্ণের নাম নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ি। লোকে অন্তত জানুক গীতায় কি আছে। এই সব বাবাজীদের কিছুতেই বোঝাতে পারিনি একবার রাশিয়াতে নিষিদ্ধ হলে অন্যান্য দেশেও একই দাবি উঠবে। একই ছেঁদো যুক্তিতে। তার চেয়ে প্রথম রাতেই বেড়াল মারা ভাল। কে শোনে কার কথা! এরা ভাবে দেখান সব বড় বড় নিষ্কাম কর্মযোগী! অন্তহীন কামনার মধ্যে দিয়ে এঁদের অনন্তের সাধনার ভণ্ডামি। এঁদের দিয়ে হবে না। যা করার আমাদেরকেই করতে হবে।

সামাজিক প্রতিদান

মূর্তি সাফাইয়ের কাজে ব্যস্ত ছাত্রদল।

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ আমেদাবাদ শহরে মোট স্ট্যাচু-র সংখ্যা কত, তার গোণা-গুণতি হিসেব এই মুহূর্তে হাতের কাছে নেই। তবে সব মিলিয়ে খান পঁয়ষট্টির কম দাঁড়াবে না এটুকু হলফ করে বলা যেতেই পারে। গুজরাটের রাজধানীতে একবার পদার্পণ করুন না! দেখবেন ইনকাম ট্যাক্স সার্কেলের কাছে মহাত্মা গান্ধীর স্ট্যাচু, এলিস ব্রীজে স্বামী বিবেকানন্দের স্ট্যাচু, নেহরুনগরে রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর স্ট্যাচু সব ঝকঝক-তকতক করছে। ওই ঝকঝক-তকতক করনেওয়ালাদের কাছ থেকেই খবর মিলেছে যে ওই তিনটি স্ট্যাচুসহ আমেদাবাদ শহরস্থিত বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের মোট ৬৫টি স্ট্যাচু সাফ-সুতরো হয়েছে গত ৩০ নভেম্বর। আমেদাবাদ পৌরসভার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হচ্ছি বলে ভাবছেন বুঝি? এক্ষেত্রে পৌরসভার প্রশংসা করাটা কতটা সমীচীন হবে জানি না, তবে পৌরসভার স্কুলগুলির প্রশংসা না করলে, সেটা রীতিমতো অন্যায়-ই হবে।

আরে অত ভাবছেন কি! গত ৩০ নভেম্বর 'অত্যন্ত মনোরম প্রভাতে' আমেদাবাদে গিয়ে যদি পড়তেন তাহলে চক্ষু ছানাবড়া হতে বাকি থাকতো না! একে শীতের বেলা, তায় আমেদাবাদ 'পশ্চিমী শহর', সূয্যিমামার উঠতে একটু দেরিই হয়ে গিয়েছিল সেদিন। হিমেল পরশ জড়িয়ে ঘুম ঘুম চোখে উঠে আমেদাবাদবাসী প্রত্যক্ষ করলেন এক অদ্ভুত দৃশ্য। আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যাল স্কুলের কচি-কাঁচা পড়ুয়ারা তাদের ছোট্ট দু'টো হাতে জলের বালতি, ন্যাকড়া, ঝাঁটা হাতে মূর্তি পরিষ্কারের কাজে লেগে পড়েছে। একে সমাজ-সেবার 'মনোহর ভ্যাকসিন' ভেবে বসবেন না। সমাজ তাকে শিক্ষা দিচ্ছে সুতরাং সমাজকেও তার কিছু ফিরিয়ে দেওয়া উচিত এই মানসিকতা থেকেই গত ১৮ নভেম্বর আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যাল স্কুল বোর্ডে ভারতীয় স্কাউট গাইড অ্যাসোসিয়েশন এক নির্দেশিকা পাঠায়। যাতে বলা হয়, বোর্ডের অন্তর্গত ৬৪টি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর ১২-১৪ বছরের ছাত্র-ছাত্রীরা ৩০ নভেম্বর আমেদাবাদ শহরের স্ট্যাচুগুলো পরিষ্কার করবে। এর মূল্যায়ন হবে তাদের স্কুল-পাঠক্রমে আবশ্যিক 'স্কাউট অ্যান্ড গাইড' সক্রিয়তায়

(অ্যাকটিভিটিস-এ)।

স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান জগদীশ ভাবসার দাবি করেছেন, এর ফলে কচি-কাঁচা ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যবোধের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা যাবে। শ্রী ভাবসারের মন্তব্য, ''সমাজ সেবার মানসিকতা গড়ে তুলতে এবং চরিত্রগঠন করতে স্ট্যাচু পরিষ্কারের এই ক্যাম্পেনকে আমরা স্কুল-শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করেছি।''

তবে ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তার দিকটা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। কেননা স্ট্যাচুগুলো রাস্তার খুব গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক মোড়ে অবস্থিত, সেই কারণে ওই এলাকগুলো কিছুটা দুর্ঘটনাপ্রবণও। তার ওপর অনেকগুলো স্ট্যাচু এত উঁচু যে খুব লম্বা মই ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে স্কাউট গাইড অ্যাসোসিয়েশন, শিক্ষকদের কড়া নির্দেশ দিয়েছেন যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা সর্বাগ্রে সুনিশ্চিত করা হয়।

এমনিতে আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এস্টেট ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব রয়েছে শহরের স্ট্যাচুগুলো পরিষ্কার করার। বর্ষাকালে অবিশ্রান্ত বারিধারায় সেগুলো প্রতিদিনই পরিষ্কৃত হলেও, বছরের বাকি সময়ে এক, বা বড়জোর বার দু'য়েকের বেশি পরিষ্কারের সুযোগ পায় না এস্টেট ডিপার্টমেন্ট। স্কাউট গাইড অ্যাসোসিয়েশনের এই পদক্ষেপে তারা বেশ স্বস্তিতে।

তবে সবচেয়ে খুশি বোধহয় সমাজ নামক ধনী থেকে নির্ধন, অন্নহীনা থেকে অন্নপূর্ণা, শহরের মেয়র থেকে রাস্তার কাগজ কুড়ুনি মানুষকে নিয়ে গঠিত সেই বস্তুটা যারা 'শুধু দিলে, পেলে না কিছুই।' কৈশোরের অঙ্কুরোদ্গমের মুখে সেই পাওনাটায় যে অন্যরকমের একটা মাত্রা আছে তা কি অস্বীকার করা যায়?

তিন দশকের সাফল্য

অন্ধ্রে মাও-হানায় মৃতের সংখ্যা ২০১১-তেই সর্বনিম্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ২০১১-র ৩১ ডিসেম্বরের অপরাহ্নে যখন এই প্রতিবেদন লিখছি, তখন অন্ধ্রপ্রদেশের পুলিশ কর্তারা বেশ উল্লসিত, আর কয়েকটি ঘণ্টা নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দেওয়ার অপেক্ষায়। গত তিন দশকে মাওবাদীদের সঙ্গে যুদ্ধে ২০১১ সালটিই একমাত্র

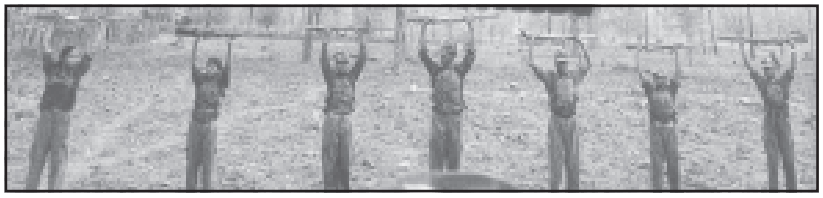

বর্ষ যখন মাও-হানায় মৃত্যু সংখ্যা একঅঙ্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল। রাজ্যে ২০১১-য় মাওবাদী হানায় সাধারণ নাগরিকের মৃতের সংখ্যা ৭, একজনও পুলিশকর্মী বা আধিকারিক নিহত হননি। গত ৩১ বছরে নকশাল হামলায় সেখানে ২,০৬৫ জন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। সেইসঙ্গে ৫৭৫ জন পুলিশ কর্মী ও আধিকারিকও মারা যান। তথ্য-পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে, ২০১১-র সাফল্য কেন উৎসাহিত করছে অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশকে।

১৯৮০ সালে গঠিত হয়েছিল জনযুদ্ধ গোষ্ঠী (পিপলস্ ওয়ার গ্রুপ বা পি ডব্লিউ জি)। সদ্য গঠিত সেই মাওবাদীগোষ্ঠী ওই বছরই ৬টি খুন সহ ৩৮টি হামলা সংঘটিত করে অন্ধ্রপ্রদেশে। তারপর থেকে ২০১০ পর্যন্ত প্রতি বছরই জনযুদ্ধ গোষ্ঠীর নাশকতামূলক কাজকর্ম উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। ১৯৮০ সালটিকে বাদ দিলে গত ৩০ বছরের মধ্যে ২০১১-তেই মাওবাদী হিংসার সংখ্যা সর্বনিম্ন--- ৬টি খুন সহ ৪১টি মাও-হামলা। নব্বই দশকের গোড়ায় ১৯৯১ সালে মাও নাশকতা সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছোয়। পুলিশি রেকর্ড অনুযায়ী ওইবছর ৯৫৩টি মাও হামলায় ৪৯ জন পুলিশকর্মী সহ ১৭৮ জন নাগরিক নিহত হন।

বর্তমান মাও-সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর অন্ধ্রপ্রদেশের ২৩টি জেলার মধ্যে ২১টি জেলাই মাও-অধ্যুষিত। মাওবাদী বিরোধী বিশেষ গোয়েন্দা বিভাগ (অ্যান্টি মাওইষ্ট স্পেশাল ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ)-এর তথ্যানুযায়ী এই বছরগুলিতে মাও-নাশকতা চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছিল, যথা--- ১৯৯০-এ ১৪৫ জন, ১৯৯১-এ ২২৭ জন, ১৯৯২-এ ২১২ জন, ১৯৯৩-এ ১৪৩ জন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয় নকশাল হামলায়। তথ্য-পরিসংখ্যান বিচার-বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, মাওবাদীদের সঙ্গে সরকার পক্ষ প্রাথমিকভাবে আলাপ-আলোচনায় গেলে নাশকতার মাত্রা মাওবাদীরা কমিয়ে দেয় ঠিকই, কিন্তু তাদের অবাস্তব দাবি ও একগুঁয়ে অনড় মনোভাবের জন্য সেই আলোচনা ভেস্তে গেলে 'অলিখিত যুদ্ধবিরতি'-তে থাকা পুলিশের ওপর প্রতিহিংসামূলক আক্রমণ চালাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না মাওবাদীরা।

এক যুগ আগে ১৯৯৯ সালে তৎকালীন এন ডি এ সরকারের আমলে নকশাল-বিরোধী বিশেষ গ্রে-হাউন্ড বাহিনী গঠিত হয়েছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকার বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিভিন্ন রাজ্য পুলিশবাহিনীকে আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে প্রশিক্ষিত ও সজ্জিত করেছিল একটাই কারণে যাতে রাজ্যগুলি মাওবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে। আর বিজেপি পরিচালিত সরকারের সেই নীতির সুফল ভোগ করে অন্ধ্র। মাওবাদীরা ওড়িশা, ছত্তিশগড় ও মহারাষ্ট্রের সীমান্তের দিকে সরে যায়। ২০০৩ থেকে আজ পর্যন্ত মাওবাদীদের ৫০ জন কেন্দ্রীয় নেতা সমেত ৮০০ কর্মী পুলিশি এনকাউন্টারে মারা যান। স্রেফ ২০০৫-এই ৪ জন সর্বোচ্চ নেতা সমেত ৩০০ মাওবাদী নিহত হওয়া ছাড়াও বহু মাও-কর্মী সমর্থক হয় গ্রেপ্তার, নয় আত্মসমর্পণ করেন। তবে ২০১১-এর সাফল্য যে ২০১২-তে আত্মতুষ্টির কারণ হবে না তা জানিয়ে বিশেষ গোয়েন্দা শাখার ডি আই জি শিবধর রেড্ডি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, ''সারা বছরের পরিশ্রম কিভাবে ম্লান হয়ে যেতে পারে তার সাক্ষী ছিলাম ২০০৮-এ বালিমেলা রিজার্ভার কাণ্ডে যেখানে ৩৩ জন গ্রে-হাউন্ড কম্যান্ডো সহ ৩৬ জন পুলিশকর্মীকে হত্যা করেছিল মাওবাদীরা।''

শোক-সংবাদ

পরলোকে ভুবনেশ্বর দাস

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালদা বিভাগের প্রাক্তন সঙ্ঘচালক ভুবনেশ্বর দাস পরলোকগমন করেছেন। গত ২৬ ডিসেম্বর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কিছুদিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বৎসর। তিনি এক ছেলে, এক মেয়ে ও বহু গুণমুগ্ধ বন্ধু রেখে গিয়েছেন।

বাল্যকাল থেকেই তিনি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। ১৯৪৪ সালে তিনি প্রথম সঙ্ঘের শাখায় আসেন। শিক্ষা শেষে ১৯৫০ সালে তিনি সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে প্রথমে কোচবিহার জেলা ও পরে মেদিনীপুর জেলায় কাজ করেন। পরে সরকারের এন সি সি বিভাগের কাজে যোগ দেন।

মালদা ও সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে স্বয়ংসেবক ও তাদের পরিবারের সঙ্গে ছিল তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক। সকলের খোঁজখবর নেওয়া তাঁর ছিল প্রায় নিত্যকর্ম। হয়ে উঠেছিলেন আপনার জন। এমনই একজন প্রবীণ স্বয়ংসেবককে হারিয়ে স্বয়ংসেবকেরা গভীরভাবে শোকাহত।

***

গত ১৫ই ডিসেম্বর রাতে বর্ধমানের স্বয়ংসেবক তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী অরুণ কুমার রায় পরলোকগমন করেন। কালনার অধিকারীপাড়ার বাসিন্দা অরুণবাবুর মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তাঁর স্ত্রী সহ দুই মেয়ে-জামাই বর্তমান। তিনি বহু সমাজকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

শরিকি গোলমালে ইন্দিরা ইন্ধন

মানস ভুঁইয়া
মাননীয় সেচমন্ত্রী, মহাকরণ

সল্টলেকের ঐতিহাসিক ইন্দিরা ভবন এবার হয়ে উঠবে নজরুল সংগ্রহশালা। বাড়ির নাম হবে নজরুল ভবন। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর দীর্ঘদিনের বাসভবনে কী হবে তা নিয়ে অনেক জল্পনা ছিল। কিন্তু ক'দিন আগেই নজরুল ভবনের ঘোষণা করে যাবতীয় জল্পনার অবসান ঘটিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইস্ আপনিও মানসবাবু সেই মন্ত্রিসভায় আছেন, যেখানে আপনার নেত্রীর প্রতিও শ্রদ্ধা উবে যায় মুসলিম তোষণের সুযোগ পেলেই। মন্ত্রীমশাই, ভাববেন না, আমি এমন অভিযোগ তুলছি। এই অভিযোগ কিন্তু আপনার দলেই নেতা আব্দুল মান্নান সাহেবই তুলেছেন— নজরুলের নামে মুসলিমদের খুশি করতে চেয়েছেন মমতা। কিন্তু মুসলিম সমাজ এত বোকা নয়। নির্বেদ রায়ও এই কথাটাই বলেছেন। উল্লেখ করে দিই এই কলমে এই পত্রলেখক অনেক আগেই বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামকে হিন্দু ও মুসলিম ভাগে ভাগ করার খেলায় মেতেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভা ভোটে জয় পাওয়ার পরদিনই তিনি যখন বললেন, পাড়ায় পাড়ায় রবীন্দ্রও বাজবে, নজরুলও বাজবে তখনই চিঠি লিখেছিলাম নেত্রীকে। দিদি, আমরা ছোট থেকেই শিখেছি, সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে বিলকুল, শুধু ভাগ হয়নিকো নজরুল। এখন মানসবাবু আপনাদের নেতারাও সেকথা বলছেন। কিন্তু বলছেন, আপনাদের নেত্রীর নাম বাদ যাওয়ার পর। আঁতে লাগার পর বুঝছেন তোষণের আঘাত। মানসবাবু, আপনি দীর্ঘদিনের কংগ্রেস নেতা। প্রদেশ সভাপতিও হয়েছেন। তবু আপনাকে একটু ইন্দিরা ভবনের ইতিহাস বলতে ইচ্ছে করছে। অনেক ইতিহাসের সাক্ষী সল্টলেকের এই বাংলো। ১৯৭২ সালে এই ভবনের উদ্বোধন করেছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের পর ইন্দিরা তখন জগৎ খ্যাত। জরুরি অবস্থার কালি লাগেনি গায়ে। সেই' ৭২ সালেই কলকাতায় সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সম্মেলনে যোগ দিতে এসে লবণহ্রদের এই বাড়িতে সপ্তাহখানেক ছিলেন প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা। প্রথম থেকেই এই বাড়ি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নগরোন্নয়ন দফতরের হাতে। মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় এবং তার পর দীর্ঘ ২২ বছর এই বাড়িতে ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। ১৯৮৯ সালে রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু হিন্দুস্থান রোডের বাড়ি ছেড়ে এই বাড়িতে ওঠেন। ২০০০ সালে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এখানেই ছিলেন জ্যোতি বসু। দেশের প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতারা বিভিন্ন সময় এসেছেন এই ভবনে। রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক টানাপোড়েনের সময় বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার এই বাড়ি কবি নজরুল ইসলামের নামে করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

মানসবাবু, ইন্দিরা গান্ধীর স্মৃতি বিজড়িত ভবনের নাম পরিবর্তন নিয়ে সমালোচনার সুর কংগ্রেসে। হবেই তো! এই ইন্দিরা পুত্র রাজীব গান্ধীর হাত ধরেই তো মমতার যুব কংগ্রেস সভানেত্রী হওয়া। সেই ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু হওয়াতেই তো তাঁর প্রথমবার সাংসদ হওয়া। অথচ দেখুন কী ব্যবহার ফিরিয়ে দিলেন তিনি!

২০১০ সালের ১৭ জানুয়ারি বসুর মৃত্যুর পর থেকেই এই বাড়িতে কী হবে তা নিয়ে নানা জল্পনা শুরু হয়। এই ভবনে বসুর সংগ্রহশালা গড়ার পাশাপাশি রাজনৈতিক গবেষণাগার গড়ার প্রস্তাবও আসে বিভিন্ন মহল থেকে। সেসব যে কিছুই হচ্ছে না তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে বেশ ক্ষুব্ধ জ্যোতি বসুর রাজনৈতিক সঙ্গীরা। সেটা তো হবেই। কিন্তু সেই বাড়িতে কী হবে? সেখানে নাকি নজরুলকে নিয়ে গবেষণা হবে। এটা শুনে তো আপনাদের নেতা অরুণাভ ঘোষ বলেই ফেলেছেন, কে করবে গবেষণা? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়! নাকি তাঁর দলের লোকেরা? অরুণাভবাবুর আরও মন্তব্য, ওই দলে তো সব অশিক্ষিতের বাস। তাঁরা আবার গবেষণা করবে কী?

যাই হোক মানসবাবু, দিল্লিতে লোকপাল বিল আর কলকাতায় ইন্দিরা ভবনের নাম বদল ইস্যুতে ক্রমশই জটিল হচ্ছে কংগ্রেস তৃণমূল-কংগ্রেস সম্পর্ক। আপনাদের মুর্শিদাবাদের নেতা অধীর চৌধুরী তো কথায় কথায় কামান দেগেই চলেছেন। বাকিরাও ইন্দিরা বিতর্কে সরব। সেই মৌখিক প্রতিবাদই বিক্ষোভের রূপ নিল ময়দানে ইন্দিরা গান্ধী মূর্তির পাদদেশে কংগ্রেসের সমাবেশে। আর সেখানে আপনারা তো ভারতীয় রাজনীতিতে ইন্দিরা গান্ধীর গুরুত্ব উল্লেখের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি আক্রমণ করতেও দ্বিধা করলেন না। না, আপনার বলা ঠিক হবে না। কারণ, আপনি তো ছিলেন না। আপনি তখন সংযমের বাণী দিলেন মহাকরণে বসে। আপনার গলায় বেশ নরম সুর।

হবেই তো। জোট সরকারে তো কিছুটা মেনে নিতেই হয়। মান-সম্মানের প্রশ্ন তুলে তো ভোটের আগেই বেশি আসন নিয়ে আপনি মানস ভুঁইয়া অনেক চিল্লিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রের নেতাদের কথায় মাথা নোয়াতে হয়েছে। আর এখন তো আপনার কেন্দ্রের সরকারের হাল আরও খারাপ। খানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে মমতাও কথায় কথায় সমর্থন তোলার হুমকি দিয়ে রেখেছেন। পাল্টা চাপ দিতে অধীর চৌধুরী একটু ফোঁস করেছিলেন, কিন্তু তাতে তৃণমূল বুঝিয়ে দিয়েছে ওসব ফোঁস দেখে তারা ভয় পাবে না। তাদের হাতে যে কেন্দ্রের টিঁকি বাঁধা।

এসব দেখে শুনে আপনার জন্য ভাবনা হচ্ছে মানসবাবু। এত করে একটু মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন। হোক সে সেচের মতো এলেবেলে দায়িত্ব তবু তো একটা পূর্ণ দফতর। এমন জটিলতায় যদি সরকার থেকে দল সরে আসে তবে তো চেয়ারটাই খোয়াতে হবে। তা কেন? দলত্যাগ তো করতেই পারেন। ও, সেখানে তো আবার আইনকানুনের প্রশ্ন আছে। যাই হোক, দেখুন ২০১২ কেমন যায়। মন্ত্রী হওয়ার পর তো আপনার দশ আঙুলের আট আঙটি খুলে ফেলেছিলেন। আবার পরে নেবেন নাকি?

নমস্কারান্তে,
—সুন্দর মৌলিক

নকল গান্ধী পদবি

নেহরু পরিবারের বর্তমান বংশধরেরা মহাত্মা গান্ধীর নাম আর বদনাম না করে গান্ধী পদবি পরিত্যাগ করুক। গান্ধীজী, জওহরলাল নেহরু ও কংগ্রেসের নরমপন্থীদের সঙ্গে মিলে, মাউন্টব্যাটেন ও জিন্নার নিকট নতিস্বীকার করে দেশভাগ করে মহাভুল করেছিলেন তা তিনি পরবর্তীকালে (Committed Himalayan blunders) স্বীকার করেছিলেন। যদিও নাথুরাম গডসের গুলিতে দুর্ভাগ্যজনকভাবে তার মৃত্যু হয়েছিল। হিন্দু রক্তে নদী বইছে মোসলের গ্রন্থে সরকারি তথ্য নির্ভর বিবৃতি অনুসারে বলা হয়েছে— 60,000 of them (Hindus, Shikhs) were killed by Muslim goondas. If they were children they were killed up by the feet, If they were children they were rapdled and the their breasts were chopped off. If they were pregnent, they were disembowelled. (Page-279)। অন্য এক সরকারি হিসেবে হত্যা ৬ লক্ষ গৃহহারা ১ কোটি ৪০ লক্ষ ধর্মান্তরিত, ১ লক্ষ নিলামে বিক্রয় নির্ধারণ করা যায়নি। এতদ্‌সত্ত্বেও গান্ধীজী শুধুই হিন্দুদের নেতা; মুসলমানদের নেতা হতে পারেননি চূড়ান্ত তোষণ করেও। গান্ধী পদবি হাইজ্যাক করে যারা সরকার পরিচালনা করছে তাদের সম্পর্কে কিছু বলা দরকার।

রাজীব গান্ধীর বোফর্স কেলেঙ্কারী থেকে সোনিয়া গান্ধীর বকলমে কংগ্রেস সরকারের নিত্যনৈমিত্তিক ভ্রষ্টাচার, দুর্নীতির কারণে, চূড়ান্ত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। কংগ্রেস ও শরিক দলের রাজা-রাণীরা জেল হাজতে বাস করেছে তবু প্রধানমন্ত্রীর কোনও হেলদোল নেই। অর্থনীতির বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় কালো টাকা ও দুর্নীতির করাল গ্রাসে পতিত। কংগ্রেসের বড় বড় রাঘব বোয়াল ও অসাধু ব্যবসায়ীদের কালো টাকা বিদেশ থেকে তারা আনতে চায় না, এটা পরিষ্কার। লালুপ্রসাদের চারা-ঘোটালা ইউ পি এ-র দুর্নীতির কাছে ছিঁচকে চুরি, তবুও আদবাণীজীর দুর্নীতিবিরোধী ও কালোটাকা দেশে ফিরিয়ে আনার আন্দোলনের পর এন ডি এ-র সাংসদরা সমবেতভাবে হলফনামা দিয়েছেন তাদের কালো টাকা নেই বলে। কিন্তু ইউ পি এ এবং কংগ্রেস হলফনামা দিয়ে অন্তত বলুক তাদের কোনও কালো টাকা বিদেশে বা দেশে নেই। কিন্তু বোধহয় হলফনামা মিথ্যা বা সত্য যাই হোক, সেটুকু সততা দেখানোর ক্ষমতা কংগ্রেস বা সরকারের নেই। মনে হয় সিপিএম, তৃণমূলসহ অন্যান্য দলের সদস্যরা উক্ত হলফনামা জমা দ্বারা চাপ সৃষ্টি করুক যাতে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়।

এদিকে সুব্রমনিয়াম স্বামীর আবেদনে আদালত সাড়া দেওয়ায় চিদাম্বরমের পদত্যাগ আসন্ন বলে মনে হয়।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার চূড়ান্ত ব্যর্থ ও অপদার্থ।

—বৈদ্যনাথ ঘোষ, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা।

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও উর্দুতে কথামৃত

শ্রীশ্রী ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাংলায় সম্প্রতি মৌলবাদী শিক্ষা সম্প্রচারের নিমিত্ত 'আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়' পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের সংক্ষিপ্ত উর্দু অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে।

আমরা ভারতীয় হিন্দুরা সাধারণত পৃথিবীর সব ধর্মকেই মূলত এক ও অভিন্ন বলে মনে করি। এবং এসময় ভারত ও বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি ও প্রচারের প্রকৃত ইতিহাস ভেবে দেখি না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মাইকেল মধুসূদনকে বলেছিলেন, '' পেটের জন্য ধর্মত্যাগ করে ভাল করেনি''। তিনি ভারতীয় ঋষিদের স্বধর্মনিষ্ঠাকে গণ্য করতেন— ''স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম ভয়াবহ''— এই বাক্যকে যথাযথ মর্যাদা দিতেন।

তিনি একটি পুকুর, তার চার ঘাট ও কেবলমাত্র একই জনকে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী বিভিন্ন নামে উচ্চারণ করে— এই উপমা দিয়ে বোঝালেন একই ভগবানকে সকল ধর্মগোষ্ঠী বিভিন্ন ভাবে উপাসনা করেন। এর দ্বারা তিনি' 'যত মত তত পথ' এই পরম সত্যটি উপলব্ধি করলেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই 'একই মাত্র মত ও পথ' ও তাই অন্যান্য সব মতকে নিশ্চিহ্ন করার মৌলবাদী মতগুলিকে খণ্ডন করলেন।

তিনি বললেন— ''ইদানীং যেসব ধর্ম দেখছ এসব তাঁর ইচ্ছেতে হবে যাবে, থাকবে না। ...হিন্দু ধর্ম বরাবর আছে, বরাবর থাকবে।''

তাই সকল শিক্ষিত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন উদার মানুষের উচিত যুক্তি ও ইতিহাসের পটভূমিতে ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে সেমেটিক মৌলবাদের তত্ত্বকে সংশোধন করতে সচেষ্ট হওয়া। যদিও কেউ কেউ সনাতন ধর্মে মৌলবাদের গন্ধ পায়, তাঁরা সনাতন ধর্মে শুভসংস্কার ও ভ্রান্তিবশতঃ কুসংস্কার এবং বারংবার ধর্ম সংস্থাপনার ঘটনাকে ভুল ব্যাখ্যা করেন। কারণ, সনাতন ধর্মই বলে, ''বসুধৈব কুটুম্বকম্''। সনাতন ধর্মসংস্কৃতি চিরকালই অন্যান্য মানবগোষ্ঠীকে সমৃদ্ধিশালী ও সুসংস্কৃত করেছেন, তাদের অস্তিত্বকে ধ্বংস করার অপপ্রয়াস করেনি।

—অমর দে, রামহরি ঘোষ লেন, কলকাতা-৯।

মকর সংক্রান্তির মাহাত্ম্য

পীতারুণ মুখোপাধ্যায়

তীর্থযাত্রা, তিথিপালন, পূজা-পার্বন ইত্যাদি যে সমস্ত ক্রিয়াকর্মাদি হিন্দুসমাজে প্রচলিত আছে, তার সবকিছুর পিছনেই একটি বিজ্ঞান, একটি সমাজভাবনা কাজ করেছে। বছরের বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন পূজা-পার্বন যেমন এই সুজলা-সুফলা দেশের মানুষের অন্তঃকরণকে শুদ্ধ রেখেছে, তাকে কলুষিত হতে দেয়নি, তেমনই দুর্গম তীর্থযাত্রা এদেশের মানুষকে কষ্টসহিষ্ণু ও সবরকম পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মতো করে শারীরিক- মানসিক ভাবে প্রস্তুত রেখেছে। মানস সরোবরের হিমশীতল জলে কিংবা রাজগৃহে উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান বাড়িয়েছে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, নাশ করেছে বহু দুরারোগ্য ব্যাধির। বিভিন্ন তিথি উদ্‌যাপন করতে গিয়ে সে সচেতন থেকেছে নভোস্থিত জ্যোতিষ্কাদির গতিবিধি সম্বন্ধে। বিভিন্ন ব্রত তাকে একাগ্রভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছে, প্রতিকূল সময়ে কিভাবে চলতে হবে তা শিখিয়েছে।

মকর সংক্রান্তি হিন্দুর তের-পার্বনের মধ্যে অন্যতম পার্বন। এই দিন সূর্যদেব দক্ষিণায়ন শেষ করে উত্তরের দিকে যাত্রা শুরু করেন। এ দিন দেবতাদের দিন শুরু। এর আগের ছয়মাস ছিল দেবতাদের রাত্রি। এ দিনের পর থেকে আবার দিনের দৈর্ঘ্য বড় হতে শুরু করে। ভারতের সর্বত্র এ দিনটি অত্যন্ত পবিত্রতার সঙ্গে পালিত হয়। দেবতাদের দিনের ভোরে মানুষ গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী ইত্যাদি নদীতে একটি ডুব দিয়ে নিজেকে নির্মল বোধ করেন। এ দিন স্নানের পুণ্যফল অন্যান্য দিন অপেক্ষা সহস্রগুণে বেশি বলে মনে করা হয়। এ দিনে নদীবক্ষে কোটি কোটি মানুষের স্নান তাদের মধ্যে একাত্মতা, ভক্তি, আত্মবিশ্বাস ও দেশের মূলধারার দর্শন, বিচার- সংস্কারাদির প্রতি নির্মল শ্রদ্ধাভাব গড়ে দেয়।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে মকর সংক্রান্তি বিভিন্নভাবে পালন করা হয়। সর্বত্রই তিল-জল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তিলকে সত্ত্বগুণের পোষক ও বিকিরণকারী বলে মনে করা হয়। এদিন তিলতৈল অঙ্গে লেপন, তিলজল দিয়ে স্থান, তিল ও গুড় দিয়ে তৈরি তিলগুড় আহার ও তিলগুড় বিতরণ ইত্যাদি কর্তব্য। তিলের দ্রব্যগুণে ধর্মভাব বৃদ্ধি হয়। বাংলায় মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে স্নান প্রসিদ্ধ। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অজস্র পুণ্যার্থী এদিন স্নানার্থে যান সাগর সঙ্গমে। উত্তরপ্রদেশে বহু স্থানে সংক্রান্তির সময়ে এক মাস ব্যাপী মাঘ মেলা হয়। পাঞ্জাবে একে বলা হয় 'মাঘী'। শ্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত এদিন চলে ভাংড়া নাচ। নাচের পরে এদিনের জন্য বিশেষভাবে তৈরি আহার্য গ্রহণ করা হয়। মহারাষ্ট্র-গুজরাটে সংক্রান্তির দিনে ঘুড়ি ওড়ানোর উৎসব হয়। অসমে এদিনটি পালিত হয় 'ভোগালী বিহু' রূপে। অরুণাচলের পরশুরাম কুণ্ডের হিমশীতল জলে স্নান উত্তর পূর্ব ভারতের হিন্দু সংস্কারের অঙ্গ। অন্ধ্রে একে বলা হয় 'পোঙ্গল'। উপকূলবর্তী অঞ্চলে এ দিনটিতে ইন্দ্রের উপাসনা করা হয়।

মকর সংক্রান্তি তিথির ধর্মীয় মাহাত্ম্য যেমন রয়েছে তেমনই জাতীয় চেতনা জাগরণেও একটি ভূমিকা রয়েছে। এই তিথিকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের মানুষ প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে কিংবা বাংলায় গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নান করে জাতীয় সংহতিবোধেরই বার্তা দেয়। তিল আর গুড়— এই তিথিতে ব্যবহৃত দুই উপকরণও তাৎপর্য বহন করে। তিল ক্ষুদ্র, ক্ষমতাহীন, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র তিল যখন গুড়ের মাধ্যমে সংগঠিত হয়, তখন তার মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত হয়। কাউকে তা দিয়ে আপন করা যেতে পারে। মূল কথা হলো এই উৎসবের মধ্য দিয়ে জাতীয় ঐক্যকে দৃঢ় করার ভাবনা লক্ষ্য করা যায়। মকর সংক্রান্তি তাই শুধু নতুন ফসল প্রাপ্তির আনন্দেরই নয়, জাতীয় একাত্মতা জাগরণেরও উৎসব।

রাষ্ট্রপতিকে লেখা চিঠিতে স্বামী অসীমানন্দের অভিযোগ

আমি হিন্দু বলেই অত্যাচারিত প্রশ্রয় পাচ্ছে মুসলমানেরা

মালেগাঁও বিস্ফোরণে (২০০৬) সাতজন মুসলিম অভিযুক্তদের জামিনে মুক্তি দেবার দশদিন বাদে স্বামী অসীমানন্দ জানিয়েছেন 'হিন্দু সন্ত্রাস' নিয়ে তিনি যে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন তা একান্তভাবে 'পুলিশি চাপ আর অত্যাচারে বাধ্য হয়েই।' গত ২৬ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী প্রতিভা পাতিলকে পাঠানো একটি স্মারকলিপিতে তিনি পুলিশি অত্যাচারের কথা বলেছেন। এই স্মারকলিপির প্রতিলিপি তিনি প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছেও পাঠিয়েছেন। চিঠিটির পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ এখানে তুলে দেওয়া হলো।

মাননীয়া রাষ্ট্রপতিজী,

আমি শ্রী নবকুমার সরকার ওরফে অসীমানন্দ আম্বালার জেলা কারগারের অন্তরীণ। এক গভীর চক্রান্তের শিকার আমি। সি বি আই, এন আই এ, এটি এস-রাজস্থান আমাকে মক্কা মসজিদ, সমঝোতা এবং আজমেঢ় বিস্ফোরণ মামলায় মিথ্যা জড়িয়ে দিয়েছে।

আমি একজন সন্ন্যাসী, পার্থিব ভোগবাসনা ছেড়ে কেবলমাত্র বনবাসী ও ভারতের জনজাতি সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছি। যেহেতু আমি খৃস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত জনজাতিদের হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনার কর্মে ব্রতী, তাই উপরোক্ত মিথ্যা মামলায় আমাকে জড়ানো হয়েছে।

আমি এই চিঠি লিখছি আমার ও আমার পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষার স্বার্থে এবং যারা 'স্বীকারোক্তি' আদায়ের জন্য অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে আমার ওপর, তাদের শাস্তি প্রার্থনা করছি।

সম্প্রতি মিডিয়া আর আমার কৌঁসুলির কাছ থেকে জানতে পারলাম যে, মালেগাঁও মামলায় অভিযুক্তরা জামিনে মুক্তি পেয়েছে আদালতের নির্দেশে। আগেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খোলাখুলি বলেলেন যে, এন আই এ এইসব অভিযুক্তদের জামিনের বিরোধিতা যেন না করে। এই নির্দেশের পর এন আই এ আমার কাছ থেকে জোর করে স্বীকারোক্তি আদায় করে, কিন্তু এদের জামিনের বিরোধিতা করেনি।

আপনি যেহেতু সংবিধানের শীর্ষব্যক্তি তাই এই বিষয়ে আপনার হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করছি।

কিসের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মালেগাঁও-এর ঘটনায় সাতজন মুসলিম অভিযুক্তদের জামিনের বিরোধিতা না করায় নির্দেশ দিতে পারে এন আই এ-কে?

স্বামী অসীমানন্দকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

যে সংস্থা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে চলে সেই এন আই এ কীভাবে নিজেদের স্বতন্ত্র সংস্থা হিসেবে দাবি করতে পারে? কীভাবে জোর করে নেওয়া 'স্বীকারোক্তি' এবং পরবর্তী সময়ে আমি যা অস্বীকার করেছি তারই ওপর ভিত্তি করে অভিযুক্তদের জামিন দেওয়া হয়? কোনও আদালতই এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করেনি।

কীভাবে এন আই এ এইসব মুসলিম অভিযুক্তদের জামিনের বিরোধিতা করল না? এবং এ বিষয়ে দেশের সরকার, আমেরিকা ও ইউ এন এ-এর মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান-ই বা হলো কীভাবে?

এটা কেমন বিচার! একদিকে আমার মতো এক হিন্দু সন্ন্যাসীকে অকথ্য নিপীড়ন সইতে হচ্ছে এবং তদন্তকারী সংস্থা দ্বারা চূড়ান্ত অপদস্থ হতে হচ্ছে এবং বলপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায় করা হচ্ছে, অন্যত্র মুসলিম অভিযুক্তরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ইশারায় জামিনে মুক্তি পাচ্ছে!

উপরোক্ত যন্ত্রণাদায়ক বীভৎস পরিস্থিতিতে শেষ উপায় হিসেবে আপনার দ্বারস্থ হচ্ছি। আমি নিরুপায়, তাই মহামান্য রাষ্ট্রপতি আপনার কাছে সনির্বন্ধ আবেদন যে, সুবিচার যেন আমি পাই আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ প্রকৃত দোষীরা যেন ছাড় না পায়।

'স্বীকারোক্তি' কীভাবে আমার কাছে থেকে আদায় করা হয়েছিল এখানে তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ

বর্ণনা করে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সি বি আই আধিকারিকরা হরিদ্বারে আমায় গ্রেপ্তার করে (১৮.১১.২০১০) এবং হরিদ্বার থেকে দিল্লী নিয়ে যাবার সময়ে ঘন অন্ধকারে বারবার গাড়ী থামিয়ে হাঁটু গেড়ে বসার নির্দেশ দেয় তারা। মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে তারা আমার জবানবন্দী নিতে শুরু করল। তারা ভয় দেখিয়ে বলল, আমি যদি তাদের নির্দেশ অমান্য করি তবে আমাকে হত্যা করা হবে। আমি যখন তাদের কথা শুনতে অস্বীকার করি তখন এরা আমাকে পাশে ছুটে চলা ট্রাক দেখিয়ে ভয় দেখিয়ে বলে যে, যদি আমি ওদের অবাধ্য হই তবে লরির তলায় ফেলে পিষে দেওয়া হবে আর বলা হবে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে আমার। আমি কখনওই এর আগে মৃত্যুভয় এত কাছ থেকে দেখিনি। এরপর আমাকে দিল্লী থেকে হায়দরাবাদ উড়িয়ে আনলো ওরা।

এমতাবস্থায় হিন্দু হিসেবে নিজেকে ভাবতে সঙ্কোচ বোধ হলো এবং মনে যেহেতু আমি এক হিন্দু তাই আমার কোনও মানবাধিকার নেই। আমার ধর্মের জন্যই আমাকে নিগৃহীত, নিপীড়িত হতে হচ্ছে। হেফাজতে আমি একা। আশাহত হয়ে এবং পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষার্থে আমি ওদের চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হই। অফিসাররা নির্দেশ দিল বাইরের কারুর সঙ্গে আমি যেন কথা না বলি এবং কোনও কৌঁসুলি যেন না নিই। অফিসার দ্বারা পরিবেষ্টিত করে আমাকে যখন আদালতে পেশ করা হোত তখন আমি ভয়ে ভয়ে থাকতাম। আদালতে দাঁড়িয়ে সব কিছু বলার জন্য মন উসখুশ করত কিন্তু আমার পরিবারের কথা ভেবেই শঙ্কায় কিছু বলতে পারিনি।

২৪.১১.২০১০ তারিখে থেকে ৪.১২.২০১০ পর্যন্ত সি বি আই তাদের হেফাজতে আমাকে রাখল। আদালত আমাকে জেরা করার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল সকাল ৯টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত। কিন্তু সি বি আই তাদের হেফাজতে এই দিনগুলিতে প্রতিদিন সারারাত আমাকে অকথ্য শারীরিক নির্যাতন করেছে। সি বি আই অফিসাররা আমাকে নানাভাবে হেনস্থাও করেছে। ১২ ডিসেম্বরের পর আমাকে স্থানান্তর করা হলো দিল্লীতে এবং সিবিআই নানাভাবে নির্যাতন করে ১৬৪টি বিবৃতি আদায় করল আমার কাছ থেকে। জেল হেফাজতে দাখিল করার আগে পর্যন্ত শারীরিক ও মানসিক নানাবিধ অত্যাচার চলতেই থাকল।

আমার জীবন দুর্বিষহ করে তুলল সি বি আই, এন আই এ অফিসাররা। তারা জেল হেফাজতেও যখন-তখন প্রবেশ করে উৎপীড়ন শুরু করতে থাকে এবং অনেক সময়ে মাঝরাতে ঢুকে নানাবিধ গালিগালাজ করতে থাকে ও অন্য বিস্ফোরণের মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হবে বলে আমাকে ভয়

লাঞ্ছিত হিন্দু সন্ন্যাসী

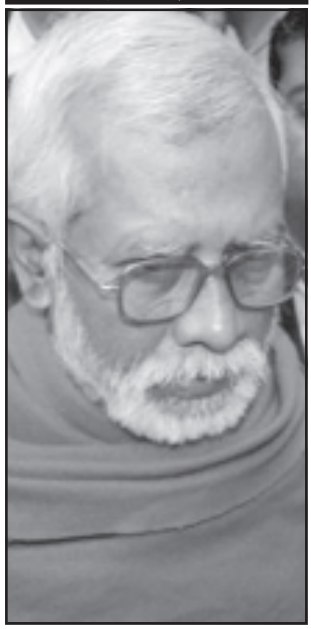

দেখায়। তারা আরও ভয় দেখায় যে, তারা আমার মা, ভাই এবং অন্য নিকটজনদের দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবে যদি আমি ওদের দাবির কাছে নতিস্বীকার না করি। তারা আমাকে আরও হুমকি দেয় এবং বলে আদালতের কাছে মুখ খুললেই তার পরিণাম ভয়াবহ হবে। আমাকে দিল্লির আদালত থেকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়। ১৮.১২.২০১০ তারিখে দিল্লী আদালতে পেশ করার সময়ে টি. রাজা বালাজি এবং সাদা পোশাকে অন্য সি বি আই আধিকারিকরা উপস্থিত ছিল। বালাজি নির্দেশ দেন তাঁর কথা শুনতে এবং টাইপ করা বক্তব্যে স্বাক্ষর করতে। প্রচণ্ড মানসিক ও শারীরিক চাপে থাকায় আমি বিচারকের কাছে অভিযোগ দায়ের করার সাহস পেলাম না যে আমাকে বলপূর্বক তৈরি করা বক্তব্যে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হচ্ছে।

আমার আশ্বাস সত্ত্বেও ওরা পুনরায় অসহ্য মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার শুরু করল। এমনকী আমার আশ্রম থেকে এক ব্যক্তিকে ধরে এনে আমাকে ভয় দেখাতে আমার সামনেই উলঙ্গ করে মারধর শুরু করল। তারা ফের ভয় দেখালো আমার অবস্থা আরও খারাপ হবে যদি ওদের কথামত আমি না চলি। সি বি আই কর্তারা আমাকে বিবস্ত্র করে পায়ুদ্বারে লাঠি ঢুকিয়ে আমার মাথা নীচে রেখে ঝুলিয়ে দেয়। তারা এমনও বলে যে, তাদের নির্দেশ মানা না হলে আমার মাকে হুগলী থেকে নিয়ে এসে এই দৃশ্য দেখাবে।

এরা আমাকে অনেক স্থানে যেমন মুম্বাই, দমন, বালসাদ ঘুরিয়ে ফের দিল্লীতে নিয়ে এলো। বিচারবিভাগীয় হেফাজতে থাকা অবস্থায় ওরা আমাকে তিহার জেলে ঢুকিয়ে দিল এবং জেলে যে সেলে আমায় রাখা হলো সেই সেলে আমার আরও দুই মুসলমান কয়েদী সঙ্গী জুটলো। তারা আমার পরিচয় জানত। তারাও সতর্ক করল আমায়। বলল, সি বি আইয়ের কথা না শুনলে এই দুনিয়া থেকে আমায় সরিয়ে দেবে। আমি ভয় পাই এবং তাদের কথার অবাধ্য হবার সাহস না থাকায় আদালতে আমি যে বয়ান দিই তা সবই তাদের নির্দেশ মতো। আমি আমার নিজস্ব কথা আদালতে বলতে পারিনি।

এরপর এন আই এ কর্তারা আমাকে হায়দরাবাদ থেকে পাঁচকুলায় নিয়ে এলো। তারা সেখানে আমাকে তাদের হেফাজতে নিয়ে অবর্ণনীয় মানসিক অত্যাচার শুরু করল।

৩ জানুয়ারি ২০১১-তে আদালত আমার স্বপক্ষে এক উকিল নিযুক্ত করল। তা সত্ত্বেও আমায় হয়রানি কমল না। আমি পরে কোনও উকিল পেলাম না, কিংবা আদালতের দাক্ষিণ্যও পাইনি। কেবল আমার একমাত্র রক্ষাকর্তা এন আই এ।

এর পরবর্তী ঘটনা হলো— এন আই এ ফের মুম্বাই নিয়ে এল। তারপর একে একে দামন ও বালসাদে। আমি তাদের এক নিরন্তর অত্যাচারের শিকার। আমি অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে তাদের বললাম, আমি আপনাদের সব কথা শুনছি, অথচ কেন আপনারা এমন অমানবিক অত্যাচার চালাচ্ছেন আমার ওপর? তারা আমাকে বলল পাঁচকুলায় আমায় বলিয়ে নেওয়া হবে যে, আমি কারুর সঙ্গে দেখা করতে চাই না, এমন কি আমার উকিলের সঙ্গেও। আমার মনে এক ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে যে আমি আর কোনওদিনই সি বি আই, এন আই এ এবং এ টি এসের রাহু গ্রাস থেকে মুক্ত হতে পারব না ও এক ধারাবাহিক ত্রাস আমার মনে চেপে বসে আছে যে সারাজীবন ধরেই এমন অত্যাচার সহ্য করে যেতে হবে। ২০১১-র তেরোই জানুয়ারী জেল হেফাজতে আমাকে আম্বালা জেলে পাঠানো হলো। ওই জেলেই মিঃ বেহেরা নামে জনৈক এন আই এ অফিসার আর তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা আমায় ডেকে পাঠিয়ে সতর্ক করে বললেন যে, আমি যেন আদালতে তাদের তৈরি বয়ান মুখস্থ বলি এবং বাধ্য ছেলে হলে আমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে অন্যথা বাকি জীবনটা জেলেই পচে মরতে হবে। পরদিনই আমাকে তলব করা হলো আম্বালা জেলের ডেপুটি সুপারের হয়ে, যেখানে এন আই এ অফিসাররা উপস্থিত ছিল। তারা একটা তৈরি করা বয়ান আমার হাতে দিয়ে বলল যে, এই বয়ান-ই আগামীকাল আদালতে গড় গড় করে বলে

যেতে হবে। পরদিন অর্থাৎ ১৫.১.২০১১ তারিখে আমাকে পাঁচকুলা সি জে এম আদালতে পেশ করা হলো এন আই এ অফিসারদের কড়া প্রহরায়। এরা সকলেই ছিল সাদা পোশাকে। তারা তাড়াতাড়ি সি জে এমের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েই বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলো। এই সব ভয়াবহ অফিসারদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তাদেরই তৈরী স্বীকারোক্তিমূলক বয়ান রেকর্ড করালাম পাঁচকুলা আদালতে।

এরপর এ টি এস নিয়ে এলো আজমেঢ়ে। তাদের হেফাজতে আমার মগজ ধোলাই করে বলা হলো কেউই আমায় কিছুই শেখাচ্ছে না। আমি হিন্দু বলে তারা উপহাস করল। তারা আমায় রাজসাক্ষী হতে বলল আর এর অন্যথা হলে আমার আর আমার পরিবারের অবস্থা করুণ হবে বলে শাসাল। তারা আমাকে বলল, রাজসাক্ষী না হলে তারা তাদের ক্ষমতা দেখাবে। তারা উপহাস করে বলল, কোথায় তোমার হিন্দু অনুগামী, কোথায় তোমার সমব্যথীরা? এরকম ভয়ার্ত আবহে আজমেঢ় বিস্ফোরণ মামলায় আমাকে দিয়ে লেখানো হলো যে, আমি রাজসাক্ষী হতে রাজি। যে সব অফিসাররা আমাকে আজমেঢ় সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে এলো তারা এক দরখাস্ত জেল কর্তৃপক্ষকে দিল এবং তারই এক প্রতিলিপি আজমেঢ় সি জে এম-কে দিল।

২০১১-র ২৬ মে বিষ্ণুকান্ত শর্মা নামে এক ব্যক্তি আজমেঢ় জেলে এসে আমাকে পূর্ণ সহযোগিতায় আশ্বাস দিয়ে বলল, আর কোনও অত্যাচার আমাকে করা হবে না। খানিকটা আশ্বস্ত হয়েই আমি তাকে এক উকিলের কথা বললাম।

আঠাশ তারিখে জে এস রানা নামে এক উকিল আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আমি তাঁকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম এবং তিনি আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন যে, অত্যাচার আর ভয় দেখিয়ে যে স্বীকারোক্তিমূলক বয়ান নেওয়া হয়েছে তা আইনসিদ্ধ নয় এবং আমি সম্মানের সঙ্গে সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্ত হব এবং বর্তমানে আমি যেভাবে ভয়ে সিঁটিয়ে রয়েছি তারও অবসান হবে।

আমি খানিকটা ভয়মুক্ত হলাম। আমি মি. রানাকে বললাম এ টি এস যেভাবে ভয় দেখিয়ে রাজসাক্ষী হবার আবেদনে সই করিয়েছিল তা প্রত্যাখ্যান করতে। আজমেঢ় আদালতে ২৯ তারিখে আমাকে পেশ করা হলে আমি আমার আবেদন পাঠ করি আর সেটি বিচারকের দরবারে পেশ করি।

আদালত ৮.৪.২০১১ সেটিকে গ্রহণ করে এবং আমি এরপর ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে থাকি। তারপর আমি সত্বর আমার পূর্ববর্তী বয়ান যা সি বি আই, এন আই এ-র রক্তচক্ষুর প্রভাবে দিল্লী আর পাঁচকুলায় দিই তা খারিজ করা আবেদন জানাই। মহামান্য আদালত তৎক্ষণাৎ তা আজমেঢ় জেল কর্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট আদালতে তা প্রেরণ করার নির্দেশ জারি করে। আমি আমার বয়ান ফিরিয়ে নেবার আবেদনের কপিটি জেল কর্তৃপক্ষকে জানাই এবং জেল সুপার তা সংশ্লিষ্ট আদালতে পাঠিয়েও দেন, কিন্তু ওই আদালতে তার মূল্যায়ন এযাবৎ হয়নি।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, আমাদের মতো এমন গণতান্ত্রিক দেশেও সি বি আই, এন আই এ এবং এ টি এসের মতো সংস্থাগুলি আইনের শাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে যথেচ্ছ ভাবে মানবাধিকারকে উপেক্ষা করে যে কোনও মানুষকে গ্রেপ্তার করতে পারে। এমন ঘৃণ্য অত্যাচারের পর আমার ধারণা হয়েছে যে, এরা আইনের ঊর্ধ্বে চলে।

মাননীয়া রাষ্ট্রপতিজী, আমার স্বীকারোক্তি অবর্ণনীয় মানসিক আর শারীরিক অত্যাচারের ফসল। এযাবৎ কোনও আদালতই এই স্বীকারোক্তির ওপর কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। কি করে মালেগাঁও বিস্ফোরণের আসামীরা জামিন পায় আমি আমার স্বীকারোক্তি ফিরিয়ে নেবার পর এবং যখন এরা তাদের জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেই?

আমার ধারণা যে, আমি হিন্দু বলেই এমন হেনস্থা, হয়রানি আর ওরা মুসলমান বলেই প্রশ্রয় পাচ্ছে, পার পেয়ে যাচ্ছে। দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক ব্যক্তির কাছে আমার মৌলিক অধিকার ফেরত পাবার দাবী জানিয়ে আর্জি জানাচ্ছি। আপনার কাছে আমার আবেদন যে, আপনি সক্রিয় হয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সি বি আই, এন আই এ এবং এ টি এস কর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন যারা আমার বিরুদ্ধে এমন ভয়ানক অপরাধ করেছে।

শ্রীমতী রাষ্ট্রপতিজী, অবাক হয়ে যাই যে, ইউ এন ও, আমেরিকাকে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করে বলা হয়েছে যে, সমঝোতা এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণের দায়ে অভিযুক্ত হুজি, লস্কর-ই-তৈবার মতো সংগঠনগুলি। অথচ আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্পূর্ণ ডিগবাজি খেয়ে ভয় দেখিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করে যে তথ্য পেশ করেছে সি বি আই-রা তাদের ওপর নির্ভর করছেন। আর এই বয়ান আমি ইতিমধ্যেই প্রত্যাখ্যান করেছি। এসবই রাজনীতির অঙ্গ এবং আমার প্রত্যাহৃত বয়ানের ওপর নির্ভর করেই মুসলমান জঙ্গীদের ছেড়ে, হিন্দুদের অভিযুক্ত করার সমানে প্রয়াস চলছে।

মহাশয়া, সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের কর্তাব্যক্তি হয়ে আমরা প্রার্থনা করি, আপনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন এবং জানবেন মন্ত্রী তাঁর কোন অধিকার বলে মিডিয়াকে জানান যে, মালেগাঁও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এন আই এ জামিনের বিরোধিতা করবে না? পরিতাপের বিষয়, রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত হয়ে মন্ত্রীর অঙ্গুলি হেলনে এন আই এ চলছে — যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার আশা, মহানুভব রাষ্ট্রপতিজী সক্রিয়তা দেখাবেন।

ম্যাডাম, যে অমানবিক, পাশবিকভাবে আমি অত্যাচারিত হয়েছি তা গণতন্ত্রের পক্ষে লজ্জাজনক। এটা আরও ঘৃণ্য যে, আমি যেভাবে নির্যাতিত হয়েছি তা কেবল হিন্দু বলেই যেখানে আইন ও মানবাধিকার সম্পূর্ণ লঙ্ঘিত আর মুসলমান বলে ওরা প্রশ্রয় পাচ্ছে। এসব কিছুই মানবাধিকার কমিশন দ্বারা তদন্ত করা হোক। এই আশাই আমি রাখি।—

নবকুমার সরকার ওরফে স্বামী অসীমানন্দ বর্তমানে হরিয়ানার আম্বালা জেলে বন্দী।

('অর্গানাইজার' পত্রিকা থেকে ভাষান্তরিত।
ভাষান্তর : তারক সাহা।)

প্রতিবন্ধকতা যেখানে হার মেনেছে

২০১১ সালের ১১ এপ্রিল। সেই দুঃসহ দিনে আহত অরুণিমা। সব বাধা পেরিয়ে আপাতত এভাবেই জয়ের স্বপ্ন। তার অটুট মনোবল ভরসা যোগাবে অজরও অনেককে।

মিতা রায়

মূকং করোতি বাচালম্
পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং
যদ্ কৃপা ত্বমহং বন্দে
পরমানন্দ মাধবম্।।

ঈশ্বরের প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তি ও আত্মসমর্পণ থাকলে বাস্তবিকই অসম্ভবকে সম্ভব করা হয়। এতো গেল আধ্যাত্মিক ভাবের কথা। কিন্তু বাস্তব জীবনেও এমনটা হতে পারে, যদি মনের জোর এবং অধ্যাবসায় থাকে, তাহলে প্রতিবন্ধী হলেও বা কোনওভাবে পঙ্গু হয়ে পড়লেও সেই প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে নিজেদের একটা জায়গায় পৌঁছে দিতে সক্ষম হওয়া যায়। এ ব্যাপারে প্রতিবন্ধী মহিলারাও পিছিয়ে নেই। নারী 'অসহায়-অবলা' বলে যাদের ধারণা— তাঁরা মেয়েদেরই শুধু নয়; প্রতিবন্ধী নারীদের দুঃসাহসিক পদক্ষেপ দেখে চোখ বিস্ফারিত করতে বাধ্য হবেন। নতুন বছরের প্রথমেই এখানে এমন দু'জন প্রতিবন্ধীর কথা তুলে ধরা হচ্ছে যাঁরা অন্যান্য প্রতিবন্ধী মহিলাদের কাছেই শুধু নয়, সমগ্র নারী সমাজের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই জানাই রুদ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। পুরুলিয়ার রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের বাংলা শিক্ষিকা। স্বাবলম্বী অর্থোপার্জনকারী রুদ্রাণী কিন্তু শারীরিকভাবে মোটেই স্বাভাবিক নন। জন্মের পর থেকেই প্রতিবন্ধকতার আবর্তে আটকে আছেন। তাঁর সারা শরীরে হাড় এমনই ক্ষণভঙ্গুর যে, যেকোনও সময়ে ভেঙে যেতে পারে। এই রোগের নাম 'অস্ট্রিও জেনেটিক্স ইমপার ফেক্টটা'। এই অসুখে স্বাভাবিক জীবনের আনন্দ তাঁর অভিব্যক্তিতে নেই। তিনি পঙ্গুত্বকে মেনে নিয়ে শুধুমাত্র মনের জোরে সাঁইত্রিশ বছরে পা রেখেছেন। পঙ্গুত্বকে কখনও দুর্বলতা হিসেবে মেনে নেননি। আর পাঁচজন মেয়ের মতোই মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় সফল। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তরে ভাল ফল করে বি. এড পাশ করেন। জীবনের লক্ষ্য ছিল শিক্ষকতা। তথাকথিত প্রতিবন্ধী রুদ্রাণী সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হলেন সম্মানের সঙ্গে। এখন তিনি পুরুলিয়ার রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের কাছে প্রিয় তো বটেই; উপরন্তু অনুসরণীয়ও। যার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্বল, সেই

মেয়েটি সব কিছুকে তুচ্ছ করে জীবন সংগ্রাম করে আজ সফলকাম। মনের জোরের পাশাপাশি অবশ্যই উল্লেখ্য, রুদ্রাণীর বাবার অফুরন্ত সহযোগিতা। বাবা ছায়াসঙ্গী হয়ে মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। শরীরের অবস্থা এতটাই ক্ষণভঙ্গুর যে বাবা স্কুলে দিয়ে আসেন শুধু নয়; ক্লাসরুমে বসিয়ে অপেক্ষা করেন, আবার অন্য ক্লাসে নিয়ে যেতে। এভাবেই পাশে থেকে মেয়েকে প্রতিষ্ঠার জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন তিনি। বাড়িতে মেয়ের যা কিছু করণীয়, মা করে দেন। এই জীবনসংগ্রামের সাফল্য প্রশংসিত ও পুরস্কৃতও হয়েছে। এটাই তাঁর জীবনের সার্থকতা। গত বছরের ৩ ডিসেম্বর 'প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শ্রেষ্ঠকর্মী'র পুরস্কার গ্রহণ করলেন রাজ্যপালের কাছ থেকে— ফলক, পদক, উত্তরীয়, শংসাপত্র ও আর্থিক পুরস্কার লাভ করে এক নজির গড়লেন। তাঁর একটাই কথা— আমার চেয়েও বেশি প্রতিবন্ধীরা প্রতিবন্ধকতাকে জয় করেছে— তাহলে আমি কেন পারব না?

জন্মগত বা জন্মের পর কোনও প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে সেটা যদিও বা জেনে নেওয়া যায়, কিন্তু সুস্থ-সবল শরীরে কোনও আকস্মিকতায় প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে তা মন থেকে মেনে নেওয়া অত্যন্ত কষ্টকর। কিন্তু সে রকম ঘটনায় অনেকেই আবার নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে— তাদের মধ্যে অন্যতম অরুণিমা সিং।

সুস্থ স্বাস্থ্যের অধিকারী অরুণিমা সিং একজন ভলিবল তারকা। জীবনের স্বপ্ন অনেক। চাকরি করে স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে গত বছেরর এপ্রিলের এগারো তারিখে চাকরির পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিলেন গৌতমবুদ্ধ নগরে অরুণিমা। হঠাৎই অপ্রত্যাশিত এক ন্যক্কারজনক ঘটনা তাঁর জীবনে অন্ধকার এনে দিয়েছি। কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁকে হঠাৎই ট্রেন থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। প্রাণে বেঁচে গেলেও একটা পা হারিয়ে এখন প্রতিবন্ধী। সাময়িক মানসিকভাবে ভেঙে পড়লেও এক পা নিয়েই নতুন স্বপ্ন তাঁর— এভারেস্ট জয়ের। শুধু স্বপ্ন নয়; তাকে বাস্তবায়িত করতে ইতিমধ্যে সবরকম ব্যবস্থা সেরে ফেলেছেন। এমনকী মহিলা এভারেস্টজয়ী বাচ্চেন্দ্রি পালের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। বাচ্চেন্দ্রি পালের প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ তাঁকে, তাঁর মনোবলকে আরও দৃঢ় করবে। এমন এক দুঃসাহসিক খেয়াল কেন— প্রশ্নের উত্তর : 'খেয়াল একটুও নয়। আমার লক্ষ্য এটা এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছবই। প্রতিবন্ধকতা কখনও সাফল্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। বিশ্বের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতেই আমার এই পদক্ষেপ।'

অসম্ভবকে সম্ভব করা যায় মনের জোর থাকলে। সাবাস অরুণিমা— সফল হোক, এই কামনা।

পরিষদের সামাজিক সমরসতা অভিযান

''পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব, আচার্যদেবো ভব।'' এই প্রবাদ বাক্যই রং-ভরো প্রতিযোগিতা ও সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে জপমন্ত্রের মতোই মুখস্থ করালেন পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক কেশব রাও দীক্ষিত। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সামাজিক সমরসতা অভিযানের অঙ্গ হিসেবে কলকাতার রাজাবাজার ও লালাবাগানে 'সুপন সুদর্শন' অনুগামী অখিল ভারতীয় হরিজন-মহাসঙ্ঘের যৌথ উদ্যোগে চিত্রাঙ্কন এবং সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। দুটি বিষয়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী এবং অন্য অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। লালাবাগান 'আমরা সবাই' ক্লাবের উদ্যোগে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয় মাণিকতলার লালাবাগানে। মঞ্চে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন— কেশবরাও দীক্ষিত, হীরালাল মল্লিক (মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক),

সমাবেশ সমাচার

হেস্টিংস ফুটবল ক্লাবের কিশনলাল মল্লিক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী অমল বসাক, লক্ষ্মী মল্লিক, চৌধুরী দাসজী, বালকৃষ্ণ লুণ্ডিয়া, দীনেশজী গোয়েল (প্রান্ত সম্পর্কপ্রমুখ) এবং বাসুদেব ঝুনঝুনওয়ালা। উদোক্তাদের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। কিশনলালজী তাঁর ভাষণে স্বীয় সমাজভুক্তদের স্বধর্মেই জীবন অতিবাহিত করার আবেদন জানান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কৈলাশ মল্লিক। চিত্রাঙ্কনে প্রথম তিন ছাত্র-ছাত্রীর নাম— সনোজ মল্লিক, নিশা মল্লিক ও সোনু মল্লিক এবং সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় প্রথম তিন ছাত্র-ছাত্রী— দিবাকর রজক, কুমারী মধু মল্লিক এবং নীলম্ মল্লিক। রাজেশ মল্লিক, কালীচরণ মল্লিক ও রণজিৎ মল্লিক সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন।

প্রাণীচিকিৎসকদের রাজ্য সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গের প্রাণীচিকিৎসকদের সংগঠন W.B.V.A.A. (ওয়েস্ট বেঙ্গল ভেটেরিনারী অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশন)-এর উদ্যোগে গত ২৪-২৫ ডিসেম্বর প্রায় ছয়শত সদস্যের উপস্থিতিতে সংগঠনের ষোড়শ দ্বি-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধন হলো কলকাতার মোহিত মৈত্র মঞ্চে, সংগঠনের সভাপতি ডাঃ বিজয় কুমার লালের সংগঠন-পতাকা উত্তোলন ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচেতক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নুরে আলম চৌধুরী ছাড়াও স্থানীয় কাউন্সিলর ও বোরো চেয়ারম্যান তাঁদের বক্তব্য রাখেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ গুরুচরণ দত্ত ও সভাপতি ডাঃ বিজয় কুমার লাল সংগঠনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশদে তাঁদের প্রতিবেদন পেশ করেন। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন কার্যকরী সমিতির চেয়ারম্যান ডাঃ অমরেন্দু বিশ্বাস, ডাঃ বিমানবিহারী ঠাকুর, ডাঃ গৌতম প্রসাদ সরখেল এবং সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক তথা অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ডাঃ শিবাজী ভট্টাচার্য। এই রাজ্য সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বে গত ২৪ ডিসেম্বর একটি মনোজ্ঞ বিজ্ঞান সভার আয়োজন করা হয়। বিষয় ছিল 'মানুষের মধ্যে বিবিধ প্রাণীবাহিত রোগের আবির্ভাব এবং পুনরাবির্ভাব রুখতে ও দমন করতে বাস্তু-স্বাস্থ্যসম্মত পদক্ষেপ'। বিজ্ঞান সভায় বহু জ্ঞানীগুণী বিজ্ঞানী ও প্রাণী– চিকিৎসকের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ভারতীয় পশু চিকিৎসা অনুসন্ধান সংস্থান-এর পূর্বাঞ্চল কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ডাঃ প্রেমাংশু দণ্ডপাট এবং প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের প্রাণীচিকিৎসা আধিকারিক ডাঃ ননীগোপাল শিট। পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারপার্সন বিশিষ্ট অধ্যাপক ডাঃ তপনকুমার মণ্ডল সভা পরিচালনা করেন। সম্মেলনের দ্বিতীয়দিন সাংগঠনিক বৈঠকে অতীত কাজের পর্যালোচনা ও আগামী দিনের এগিয়ে চলার রূপরেখা নিয়ে আলোচনা ও নীতি নির্ধারিত হয়।

আর্যসমাজের বার্ষিক উৎসব

গত ২৪ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত আর্যসমাজ-কলকাতার পক্ষ থেকে নয়দিনব্যাপী বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। প্রথম দিন পতাকা উত্তোলন ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে উৎসবের সূচনা হয়। পরে কলকাতার ঋষিকেশ পার্কে বেদ প্রবচন, বৈদিক শান্তি যজ্ঞ, মাতৃসম্মেলন, সৎসঙ্গ, বালক ও যুব সম্মেলন এবং ঋষি লঙ্গর অনুষ্ঠিত হয়। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন স্বামী সুমেধানন্দ সরস্বতী, ডঃ সোমদেব শাস্ত্রী, বেদপ্রকাশ শাস্ত্রী, ডঃ অন্নপূর্ণা, বাসুদেব শাস্ত্রী প্রমুখ। আর্যসমাজের বিভিন্ন শাখা ছাড়াও আর্যকন্যা বিদ্যালয় এবং রঘুমল আর্য-বালক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অনুষ্ঠানে ও শোভাযাত্রায় যোগ দেন।

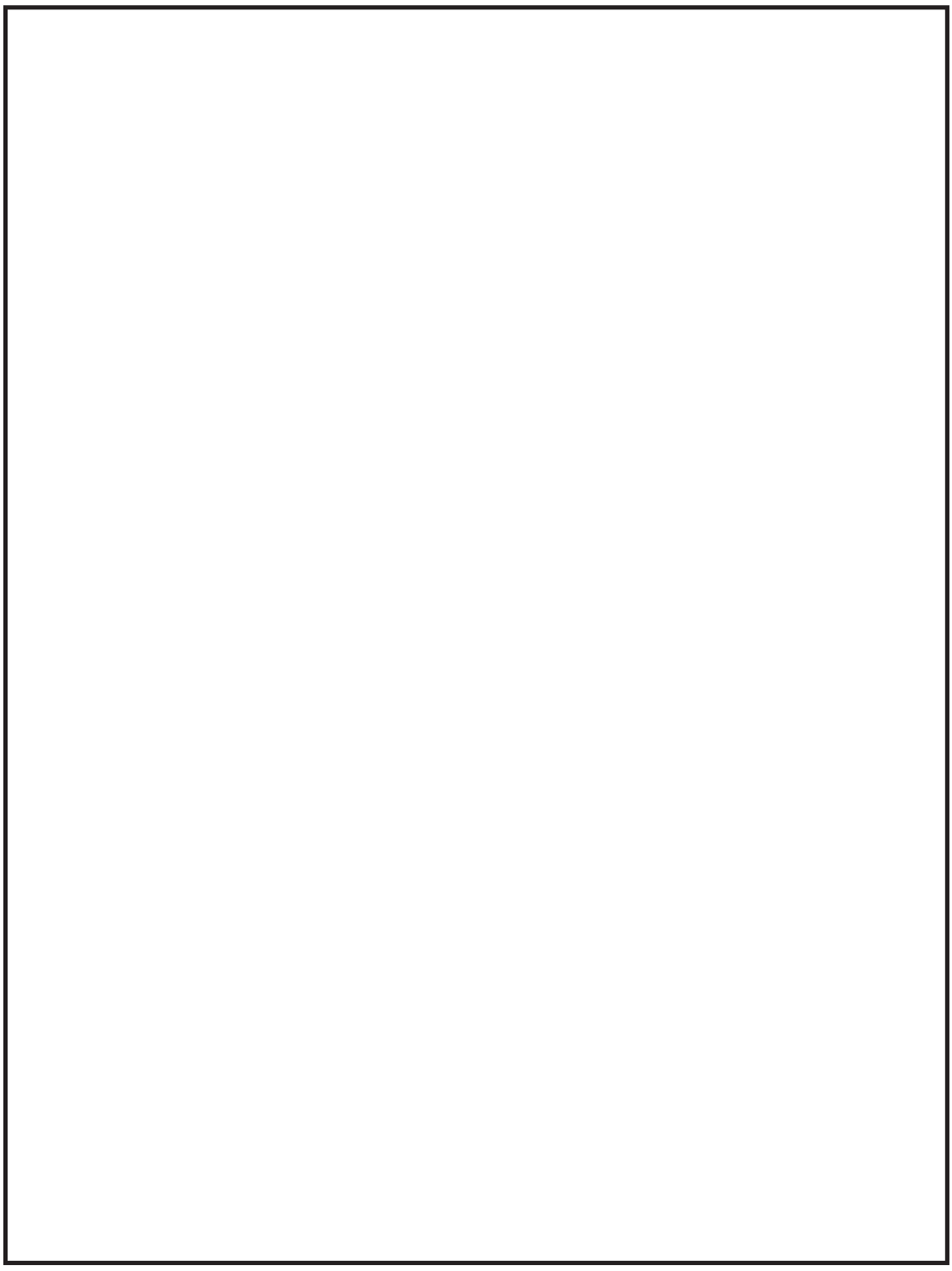

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের জন্মশতবর্ষে আখর-এর নাট্যনিবেদন 'প্রীতিলতা'

বিকাশ ভট্টাচার্য

'ওরা বীর, ওরা আকাশে জাগাত ঝড়
ওদের কাহিনী বিদেশীর খুনে
গুলি, বন্দুক, বোমার আগুনে
আজও রোমাঞ্চকর।'
(আখর-এর প্রচার পত্র থেকে)

পরাধীন ভারতে যে সমস্ত বীর সৈনিক দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষত যুব-ছাত্র সমাজের ইংরেজ অপশাসনের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামের কথা আমরা কি ভুলতে পারি? ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, উল্লাসকর দত্ত, বাঘা যতীন এবং পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অমর সেনানী মাস্টারদা সূর্য সেনের যুব-ছাত্র বাহিনীর ইন্দুমতী, প্রীতিলতা, মুকুল ও কল্পনা দত্ত প্রমুখ বীরাঙ্গনা নারীর আত্মবলিদান আজও আমাদের উদ্বুদ্ধ করে।

গ্লোবালাইজেশনের অমোঘ প্রভাবে আজকের যুবসমাজ মাল্টিপ্লেক্স, রিয়েলিটি শো-এর চক্রব্যূহে যখন ঘুরে মরছে— তখন প্রয়োজন ছিল এই সমস্ত বিপ্লবী যুব-ছাত্রদের আত্মত্যাগের কথা আজকের প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা। দুঃখের কথা সম্প্রতি বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের জন্মশতবর্ষ নীরবে চলে গেল। না সরকার, না কোনও ছাত্র-যুব সংগঠন এই বিপ্লবীর জন্মশতবর্ষ উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে পালন করলেন।

আশার কথা 'পাইকপাড়া আখর'— একটি নাট্যদল হয়েও তাদের সাম্প্রতিক নাট্য প্রযোজনায় এই বীরাঙ্গনা নারীকে স্মরণ করেছেন। আখর-এর পথচলা বেশীদিনের নয়। তবে এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁরা অতীত দিনের সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী গহরজানকে নিয়ে 'জান-এ-কলকাতা', শ্রীরামকৃষ্ণ- বিবেকানন্দ-এর বৈদান্তিক চিন্তা-ভাবনা নিয়ে 'কথামৃত' এবং সম্প্রতি জন্মশতবর্ষে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের স্বাধীনতা সংগ্রামের অমর কাহিনী নিয়ে 'প্রীতিলতা' মঞ্চস্থ করে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলার নাট্যজগতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'নাটকে লোকশিক্ষে হয়।' 'আখর' নাটককে শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম না ভেবে— একে যথার্থই লোকশিক্ষার বাহন রূপে গ্রহণ করেছেন। অবশ্য 'আখর' নতুন দল হলেও এর পেছনে আছেন বাংলার নবনাট্য আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব অসিত বসু— যিনি গতশতকের সত্তরের দশকের টালমাটাল সময়ে 'কলকাতার হ্যামলেট' করে আমাদের চমকে দিয়েছিলেন।

'প্রীতিলতা' নাটকে আমরা দেখি মাস্টারদা সূর্যসেন যখন গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিং, নির্মল সেন, লোকনাথ বল প্রমুখ বিপ্লবীকে নিয়ে চট্টগ্রামের আকাশে-বাতাসে বিপ্লবের ঝড় তুলেছেন, তখন প্রীতিলতা, কল্পনা— এঁরা ছাত্রী। কিন্তু দেশ-কাল-সমাজের দুর্দশার কথা ভেবে শুধু পড়ায় তাঁদের মন নেই। তাই এঁরাও বিপ্লবী দলের গোপন কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে এগিয়ে এসেছিলেন। প্রথম প্রথম মাস্টারদা এঁদের অর্থাৎ মেয়েদের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে জড়াতে চাননি। কিন্তু প্রীতিলতা, কল্পনা দত্ত এঁদের বন্যাত্রাণে, অস্ত্র কেনার জন্য অর্থ সংগ্রহে এবং অস্ত্রচালনায় পারদর্শিতা দেখে শেষ পর্যন্ত অগ্রগামী সৈনিকের দলে এঁদেরও ঠাঁই দেন। হাতে রাইফেল তুলে দেন। কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ মন্ত্র।

এর আগে টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়ে, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখল করে বিপ্লবীদল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠ করে ইংরেজের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল তারা, চট্টগ্রাম কয়েকদিনের জন্য স্বাধীনও হয়েছিল। চট্টগ্রামের আকাশে তেরঙ্গা পতাকা তুলেছিল ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মি অফ চিটাগাং। ইংরেজরা চরম আঘাত হেনেছিল জালালাবাদ পাহাড়ে আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের এগারোজনকে হত্যা করে! বিপ্লবী দলের প্রমুখ যাঁরা তাঁরা আত্মগোপন করে আছেন। এই সময় মাস্টারদা চট্টগ্রামের ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের দায়িত্ব দিলেন প্রীতিলতাকে। সঙ্গে ছিলেন এগারোজন বিপ্লবী। এই যুদ্ধে প্রীতিলতা শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষ হোয়াইট স্কিনকে গুলিবিদ্ধ করেন! কিন্তু ইউরোপীয়ান ক্লাবের পতন ঘটলেও শেষ মুহূর্তে ইংরেজের সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ার আগে পটাসিয়াম সায়নাইড মুখে দিয়ে প্রীতিলতা মৃত্যুবরণ করেন (১৯৩২)।

নাটক, সঙ্গীত ও নির্দেশনায় রয়েছেন ভদ্রা বসু। তিনি একটি ছোট ভূমিকায় অভিনয়ও করেছেন। অভিনয়ে প্রীতিলতার ভূমিকায় দামিনী মুখোপাধ্যায় অপূর্ব অভিনয় করেছেন। কল্পনা দত্তের ভূমিকায় আনন্দী বসুও চমৎকার। এঁরা দুজনেই নাটকের প্রয়োজনে অপূর্ব গান গেয়েছেন। ভদ্রা বসুকে জিজ্ঞেস করে জানলাম প্রীতিলতা ও কল্পনা দত্ত দু'জনেই সুন্দর গান গাইতে পারতেন! নাটকের বলিষ্ঠ দিক দৃশ্যে দৃশ্যে স্বদেশী গানের প্রয়োগ। এ সমস্ত গান আজ আর তেমন শোনা যায় না। বিশেষ করে সরলাদেবীর হিন্দু মেলায় গীত গান ''অতীত গৌরববাহিনী, মম বাণী গাও আজি হিন্দুস্থান'' গানটি সুপ্রযুক্ত। স্বদেশী গান ছাড়াও আরও দুটি গান রবীন্দ্রনাথের 'বহে নিরন্তর' এবং দ্বিজেন্দ্রলালের 'বেলা বহে যায়' সুন্দরভাবে নাটকে প্রয়োগ করেছেন নির্দেশক। দ্বিস্তর মঞ্চ পরিকল্পনাও সুন্দর। বাদল দাসের আলো যথাযথ। সূর্য সেনের ভূমিকায় অত্যন্ত সংযত অথচ ঋজুতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন বর্তমান সময়ের ছোটপর্দা ও বড়ো পর্দার ব্যস্ত অভিনেতা সুদীপ মুখোপাধ্যায়। হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি যে নাটকের জন্য সময় বের করে মঞ্চাভিনয়ে এগিয়ে এসেছেন, তার জন্য তাঁকে সাধুবাদ জানাই। পরিশেষে একটি নম্র নিবেদন। নাটক সম্পূর্ণভাবে ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে। দু-একজন ইংরেজ চরিত্র যেমন, হোয়াইট স্কিন, রেডকেইস— এঁরা মঞ্চে এলে ভালো হোত।

শব্দরূপ-৬০৯ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

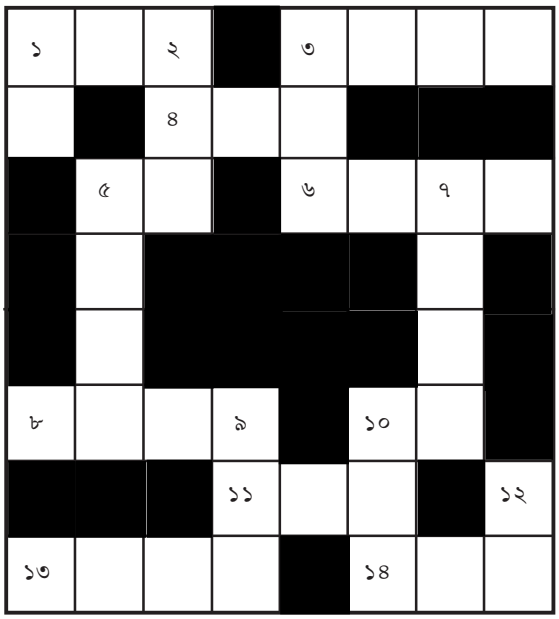

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. দেবরাজ ইন্দ্র, **৩.** অশোকের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা-গুরু, **৪.** গৌরী, পার্বতী, **৫.** ''—, আপন প্রাণ বাঁচা'', **৬.** ভাদ্র কৃষ্ণা ও শুক্লা চতুর্থীর চন্দ্র যাহা দেখিলে দোষ হয়, **৮.** গণেশ, **১০.** ভীমের হাতে নিহত রাক্ষস বিশেষ, **১১.** স্তম্ভাকৃতি চূড়া বা মন্দির, **১৩.** গাড়ির যে কাঠে জোয়াল লাগানো থাকে; লক্ষ্যার্থে যুগপ্রবর্তক, **১৪.** বিদ্যুৎ।

উপর-নীচ : ১. ব্রহ্মার পুত্র; ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা (''— সংহিতা''), **২.** ছোট বাগান, **৩.** স্রোতের প্রতিকূল দিক, **৫.** এক চান্দ্রমাসসাধ্য ব্রত বা প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ যাহাতে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে প্রত্যহ আহার নিয়মিত হয়, **৭.** যতদিন মহারাজ অশোক অদীক্ষিত ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির নৃপতি ছিলেন, ততদিন তিনি এই নামে অভিহিত হইতেন, **৯.** অন্ধকার, **১০.** দুর্গা; প্রথম দুয়ে আশীর্বাদ, **১২.** বিড়ালী (আদরে)।

সমাধান
শব্দরূপ-৬০৭

সঠিক উত্তরদাতা

সুশীল কয়াল
৯এ, অভেদানন্দ রোড
কলকাতা-৬

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

ভা	র্গ	ব	■	ভা	নু	ম	তী
স	■	সু	না	মি	■	■	■
■	রা	ধা	■	নী	ল	ক	ণ্ঠ
■	জ	■	■	■	■	র্ম	■
■	রো	■	■	■	■	যো	■
জ	গ	দী	শ	■	বে	গ	■
■	■	■	ম	ঘ	বা	■	স
শূ	র	সে	ন	■	ক	শ্য	প

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৬০৯ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৩ জানুয়ারি, ২০১২ সংখ্যায়

।। চিত্রকথা।। শ্রীরামের পূর্বপুরুষ দিলীপ।। ৬

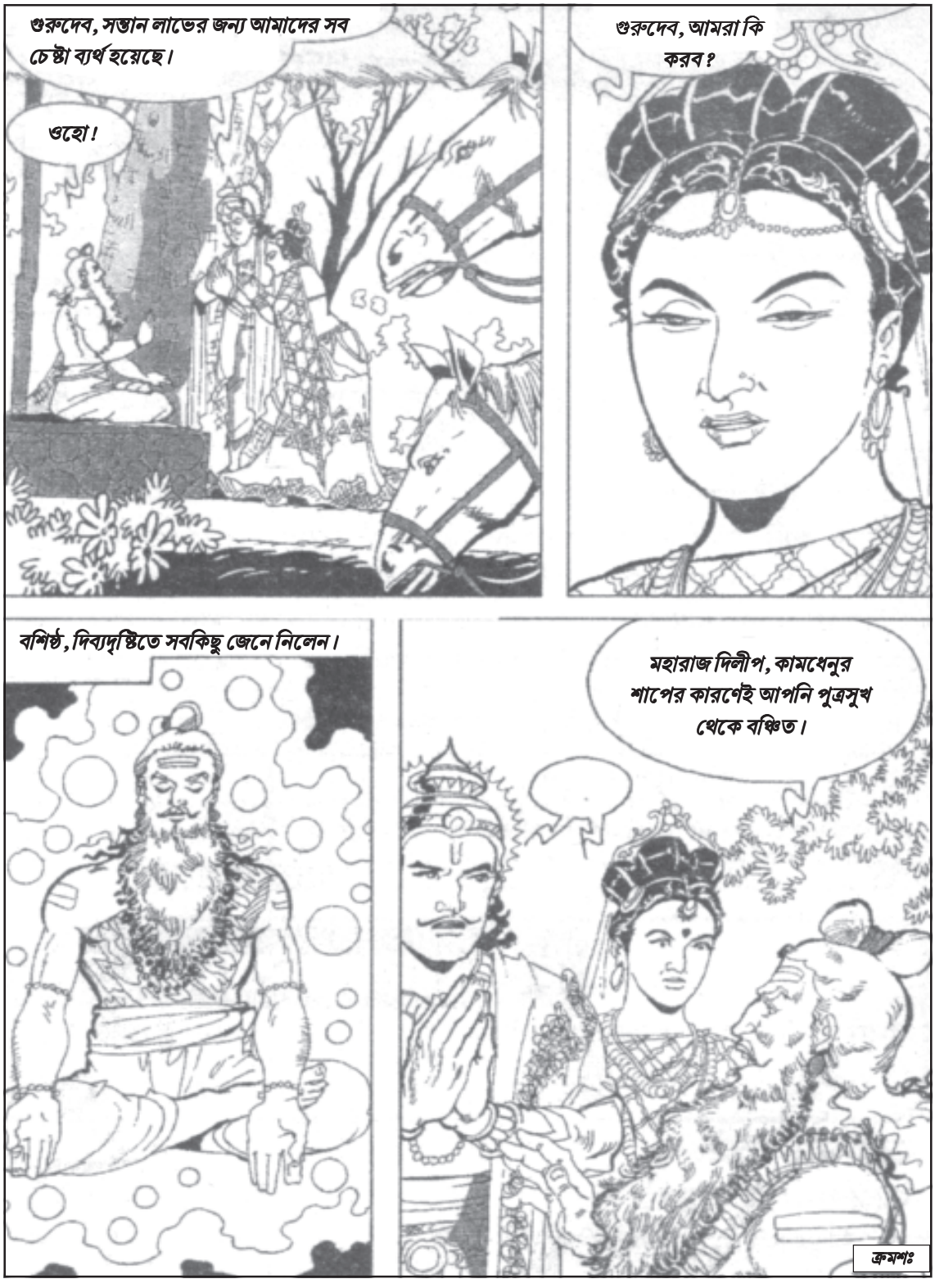

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

মুসলমানরা হিন্দু দলগুলির কাছে 'জোলাতি গোরু'

শিবাজী গুপ্ত

আঞ্চলিক ভাষাতেই রচনার মুখপাত করা যাক। কথাটা হলো : ''জোলাইত্‌কা গোরু, নাদতে দুঃখু পায়, লেজ তুলি ধরে।'' অর্থাৎ এক একান্নবর্তী চাষী পরিবারে অনেকগুলি গোরু-বাছুর ছিল। তাদের প্রতি বাড়ির কারও তেমন নজর ছিল না। সময়ে খাবার দেওয়া, গোয়াল পরিষ্কার করা, মাঝেমাঝে স্নান করানো ইত্যাদি বিষয়ে কারও তেমন গা ছিল না। গোরুরা যেমন থাকে, তেমনই ছিল আর কি।

তার মধ্যে একটি গোরু ছিল জোলাতি অর্থাৎ ব্যক্তিগত -personal বা private। পরিবারের কারও বিয়ের সময় কন্যার পিতা কন্যাদানের সঙ্গে একটি গোরুও দান করেছিলেন। সেটিকে 'জোলাতি গোরু' বলা হয়। তার আদর যত্ন আলাদা। সময়মতো প্রচুর পরিমাণে খোল-ভূষি খাওয়ানো হয়। তার ঘরখানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। সকাল সন্ধ্যা সময়মতো গোয়ালে ঢোকানো ও বাহির করা হয়, দুপুরে শিং-এ তেল মাখিয়ে স্নান করানো হয়। সন্ধ্যাকালে গোয়ালে ধূপধুনা দেওয়া হয়। রাত্রিবেলা মশার উপদ্রব থেকে বাঁচাতে চটের মশারি খাটিয়ে দেয়া হয়। তারা গোরুটার প্রতি এতই যত্নশীল ছিল যে, লাদবার অর্থাৎ মলত্যাগের সময় লেজ তুলে ধরতো, পাছে গোরু মলত্যাগ কালে ব্যথা পায়!

কথাটা হাস্যকর বটে, কিন্তু অত্যন্ত খাঁটি কথা। কারও কোনও বিষয়ে অতিরিক্ত দুর্বলতা দেখলে বা কোনও কিছুর প্রতি বেশি আসক্তি দেখা গেলে, লোকে ঠাট্টা করে বলতো— ''জোলাইত কা গোরু; লাদতে দুঃখু পাবে— তাই লেজ তুলে ধরে।''

প্রায় ভুলে যাওয়া কথাটি মনে পড়ল দেশে মুসলমানদের মন জোগাবার জন্য শেখভজা সেকুলার দলগুলির মধ্যে কাড়াকাড়ি দেখে। তাদের কাছে মুসলমানরা যেন জেলাইত্ কা গোরু। কংগ্রেস মুসলমানদের টাট্টির পানি জোগাতে বদনা হাতে রেডি। টিএমসি পেশাবের পর জলখরচ করতে গাড়ু হাতে ছুটছে। ওদিকে অজু করার পানি জোগাতে ব্যর্থতার ফলে সিপিএম-কে তো গদি হারাতে হলো। লালুপ্রসাদ মোল্লাদের গায়ের লোম ছাঁটতে ক্ষুরে শান দিয়ে বসে আছে। তার সাকরেদ ও সঙ্গী রামবিলাস পায়ের নখ কাটার জন্য নরুণ নিয়ে অপেক্ষারত। মুলায়ম সিং যাদব একবার করসেবকদের ঠেঙিয়ে হাতের সুখ করে নিয়েছে, এখন হয়তো অপেক্ষা করছে আবার কবে তেমন সুযোগ আসবে, করসেবকদের রাম ঠেঙানি দিয়ে হারামদের আরাম দেবে।

দেশে কেন্দ্রে এমন একটা সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছে যাদের কাছে সীমান্তের পবিত্রতার কোনও দাম নেই। যেদেশ সীমান্ত সুরক্ষা করতে পারে না, সে সরকার তো দেশবাসীর ধনপ্রাণের সুরক্ষা করতেও অক্ষম অপারগ। দেশের সীমান্ত রক্ষা নারীর সতীত্ব রক্ষার মতোই পবিত্র কর্তব্য। সে কর্তব্য পালন করা দূরে থাকুক, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি যেন ভারতের মাটি দখলের জন্য লালায়িত হয়েছে। সাত-সাতটি রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকলেও একটি রাষ্ট্রকেও ভারত বন্ধুরাষ্ট্র বলে মনে করতে পারে না। প্রত্যেকেই ভারতকে বেকায়দায় ফেলে বগল বাজাতে উৎসাহী। চীনের শত্রুতা এবং তাদের মদতে নেপালের শত্রুতা বোঝা দুষ্কর নয়, পাকিস্তানের সঙ্গে তো জন্মশত্রুতা, তা কখনও ঘোচার নয়, কিন্তু নিকটতম প্রতিবেশী বাংলাদেশকে কি কখনও বন্ধুরাষ্ট্র বলে গ্রহণ করা যায়? বাংলাদেশ সরকারের দু'চারজন কর্তা ব্যক্তি ও প্রধানমন্ত্রী কি বলেন বা করেন তা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু সে দেশের বিরোধী দলগুলি এবং জনতার বৃহদংশ আদৌ ভারতবন্ধু নয়। ভারতের সঙ্গে যে কোনও রকম ন্যায়সঙ্গত বোঝাপড়ার তারা বিরোধী। তাদের সবসময় অভিযোগ বাংলাদেশ সরকার নাকি বাংলাদেশকে ভারতের কাছে বেইচ্যা দিচ্ছে। বাংলাদেশের কি যে আছে ভারতের কাছে বেইচ্যা দেবার জন্য তা তো বুঝি না। প্রতিদিন যে ৪০০/৫০০ ট্রাক-লরি বাংলাদেশে ঢুকছে সেগুলি সাতদিন বাংলাদেশে ঢোকা বন্ধ করে দিলেই বাছাধনরা টের পাবে বাংলাদেশ বিক্রয়যোগ্য পণ্য কিনা।

আন্তর্জাতিক বজ্জাত রাষ্ট্র চীন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ দুটি রাষ্ট্রকেই ভারতের বিরুদ্ধে লেজে খেলাচ্ছে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে। পাকিস্তানের শত্রুতার অর্থ বোঝা যায়, কিন্তু বাংলাদেশের মিঠামিঠা হাসির পেছনে যে চীনা ছুরিকা লুকিয়ে আছে, তা তো বোঝা দুষ্কর নয়। পাকিস্তান যদি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের পীঠস্থান হয়, বাংলাদেশ হলো ভারতবিরোধী শক্তি এবং যতরকম গুণ্ডামী, বদমাইসী, চোরাচালানী, পাচারকারী, মাদক ও নারী চালানী, নোট জালিয়াতি, বেআইনী অস্ত্র আমদানি এবং ভারত-বিরোধী সন্ত্রাসীদের আশ্রয়স্থল। ভারতের ক্ষতিসাধন করেই দেশের শত্রুরা বাংলাদেশে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় পায়। আজ পর্যন্ত একটা অপরাধীকে তারা ভারতের হাতে তুলে দিয়েছে কি? দেয়নি এবং দেবেও না, কারণ তা হবে ইসলামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। কোনও মুসলমান প্রাণ থাকতে তা করবে না, করতে পারে না। তা হলে সে ধর্মভ্রষ্ট হবে। ফলে মুসলিম দুষ্কৃতীদের ধরা বা শাস্তিদান একপ্রকার অসম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গে দেশী-বিদেশী মুসলমান দুষ্কৃতীদের (যার শতকরা ৯০ জন মুসলমান) নিরাপদ চারণভূমি তার কারণ সমগ্র মুসলমান সমাজ তাদের আশ্রয়দাতা। তাদের গতিবিধি সম্পর্কে কোনও মুসলমান মুখ খোলে না। পুলিশ ধরতে গেলে মার খেয়ে মরে।

তাদের হাতে একটাই অস্ত্র— তা হলো গোষ্ঠীবদ্ধ ভোট। এই গোষ্ঠীবদ্ধ ভোটের জোরেই রাজনৈতিক দলগুলির কাছে তারা ''জোলাতি গোরু'' বলে গণ্য। ভোটের লোভেই তারা মুসলমানদের পায়খানার পানি জোগায়, রোজার পর নাস্তা জোগায়, দাঁত খোঁচার খড়কে জোগায়। মাথায় টুপী চাপায় পায়ে তেল মালিশ করে। দুর্ভাগ্যবশত লেজ না থাকায়, মলত্যাগের সময় লুঙ্গি তুলে ধরে না।